বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনঃ একটি সমীক্ষা

(The Evolution of Land Management System in Bangladesh: A Study)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ
অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

মারুফা আক্তার
নিবন্ধন নং : ১৩১, শিক্ষবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০,বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন ঃ একটি সমীক্ষা

(The Evolution of Land Management System in Bangladesh: A Study)

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, মারুফা আক্তার, এম.ফিল গবেষক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, আমার তত্ত্বাবধানে **"বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন ঃ একটি সমীক্ষা (The Evolution of Land Management System in Bangladesh: A Study)"** শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. প্রোগ্রামের আওতায় এই এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। তার প্রণীত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল বা উচ্চতর কোন ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি। আমি তার সম্পূর্ণ গবেষণার খসড়া ও অধ্যায়গুলো পাঠ করেছি এবং তার এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের অংশ হিসেবে অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মনে করছি।

আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

N.A. Kalimullah
২৪/০৪/২০২৪

প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

তারিখ
২৪ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন ঃ একটি সমীক্ষা (The Evolution of Land Management System in Bangladesh: A Study)"** এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। অত্র অভিসন্দর্ভে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে যেসব তথ্য নিয়েছি তা তথ্যসূত্রে উল্লেখ করেছি। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকি অংশ আমার নিজের। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা উচ্চতর কোন ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি।

আমি এই মর্মে আরও ঘোষণা করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

Marufa
24.04.24

মারুফা আক্তার
এম.ফিল গবেষক,
লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০,বাংলাদেশ।

তারিখ
২৪ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ উচ্চতর গবেষণা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পথিকৃতের নিদর্শন স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটি উচ্চতর ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে অপরিসীম ধৈর্য সহকারে সহযোগিতা করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম করেছেন। তিনি প্রয়োজনে নির্দ্ধিধায় তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি আমার ঋণ ও গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ঢ

বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ গবেষণায় আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আমার পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেকে নানাভাবে আমাকে প্রেরণা ও সহায়তা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার স্বামী ইমরান হাসান এর প্রতি যিনি সবসময় আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহ, প্রেরণা দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন। সর্বশেষ আমার সন্তানদ্বয় মারুফ হাসান ও ইয়াসনা হাসান এর প্রতি কৃতজ্ঞ এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সব সময় আমাকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	i
প্রত্যয়ন পত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
সূচীপত্র	v-viii
সার-সংক্ষেপ	ix-x
অধ্যায় ১ঃ ভূমিকা	
১. সূচনা	১
২. পটভূমি	২-৩
৩. সমস্যার বিবরনী	৪
৪. গবেষণার তাৎপর্য	৪
৫. গবেষণার উদ্দেশ্য	৫
৬. গবেষণার প্রশ্ন	৫
৭. গবেষণা পদ্ধতি	৫-৬
৮. সাহিত্য পর্যালোচনা	৬-১০
৯. ধারনাগত কাঠামো	১০
৯.১ ভূমি	১০
৯.২ ভূমি ব্যবস্থা	১০
৯.৩ ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন	১১
৯.৩.১ ভূমি আইন ব্যবস্থা ও বিবর্তন	১২
৯.৩.২ ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা ও বিবর্তন	১২
৯.৩.৩ ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও বিবর্তন	১২-১৩
১০. এক নজরে ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস	১৩-১৫
১১. অধ্যায় পরিশেষ	১৫
অধ্যায় ২ঃ ভূমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তন	
১. সূচনা	১৬
২. বাংলাদেশের ভুমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তন	১৬
২.১ ভূমি মালিকানায় পরিবর্তন	১৬
২.১.১ বৃটিশ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন:	১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

২.১.২ ব্রিটিশ শাসনামলের অবসান ও পাকিস্তান আমলের আইন	১৮
২.১.৩ বাংলাদেশ আমলে ভূমি মালিকানার পরিবর্তনে আইনের প্রভাব	১৮-১৯
২.২ ভূমি হস্তান্তরের পরিবর্তন	১৯
২.২.১ ব্রিটিশ আমলের ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন	১৯-২০
২.২.২ পাকিস্তান আমলে ভূমি হস্তান্তরের পরিবর্তনে আইন	২০-২১
২.২.৩ বাংলাদেশ আমলের সংশোধনী আইন:	২১
২.৩ রায়ত/কৃষক ও জমিদারের/সরকারের সম্পর্কের পরিবর্তন	২১
২.৩.১ বৃটিশ আমলের আইনের প্রভাব	২১-২২
২.৩.২ পাকিস্তান আমলের আইনের প্রভাব	২২-২৩
২.৩.৩ বাংলাদেশ আমলের আইনের প্রভাব	২৩
২.৪ ভূমি দখল নিয়ে বিরোধ নিরসনে পরিবর্তন	২৩
২.৪.১ বৃটিশ আমলে ভূমি নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমি আইন	২৪
২.৪.২ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের প্রণীত আইনের প্রভাব	২৪-২৫
৩. অধ্যায় পরিশেষ	২৫
অধ্যায় ৩ঃ ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তন	
১. সূচনা	২৬
২. বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তন	২৬
২.১ রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পরিবর্তন	২৬-২৭
২.১.১ ব্রিটিশ আমলের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা (বোর্ড অব রেভেনিউ)	২৭-২৮
২.১.২ পাকিস্তান আমলের রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট বা রাজস্ব বিভাগ	২৮-২৯
২.১.৩ বাংলাদেশ আমলের ভূমি মন্ত্রণালয়	২৯-৩০
২.১.৪ স্বাধীনতার পর রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সমস্যা	৩০
২.২ ভূমি প্রশাসনের মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তন	৩১
২.২.১ বাংলাদেশ আমলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড গঠন	৩১
২.২.২ ভূমি প্রশাসন বোর্ডের বিলুপ্তি ও ভূমি আপীল বোর্ড গঠন	৩২-৩৩
২.৩ ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পরিবর্তন	৩৩-৩৪
২.৩.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড	৩৪-৩৫
২.৪ রেকর্ড ও জরিপ প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন	৩৫
২.৪.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৩৬
২.৪.২ জোনাল সেটেলম্যান্ট অফিস	৩৬-৩৭
২.৪.৩ উপজেলা সেটেলম্যান্ট অফিস	৩৭
২.৫ ভূমি প্রশাসনে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পরিবর্তন	৩৭-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তন	৩৮-৩৯
২.৭ ভূমি রাজস্ব হিসাব নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পরিবর্তন	৩৯
২.৭.১ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর	৩৯-৪০
২.৮ উপকূলীয় ও চরভূমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এর লক্ষ্যে গঠিত প্রশাসন	৪০
২.৯ ভূমি হস্তান্তর নিবন্ধন প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন	৪০-৪১
২.৯.১ জেলা রেজিস্ট্রার	৪২
২.৯.২ সাব-রেজিস্ট্রার	৪২
২.১০ ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় মাঠ প্রশাসনের পরিবর্তন	৪২-৪৩
২.১০.১ বিভাগীয় কমিশনার অফিস	৪৩
২.১০.২ কালেক্টরের অফিস (ডিসি অফিস)	৪৪
২.১০.৩ উপজেলা ভূমি অফিস	৪৪
২.১০.৪ ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৪৪
৩.অধ্যায় পরিশেষ	৪৪
অধ্যায় ৪ঃ ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তন	
১. সূচনা	৪৫
২. বাংলাদেশের ভুমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তন	৪৫
২.১ রাজস্ব আদায়ে ভূমি কর ব্যবস্থাপনার বিবর্তন	৪৫-৪৬
২.২ ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৪৬-৪৭
২.৩ ভূমি রেকর্ডিং ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৪৭-৪৮
২.৪ ভূমি নামজারি ও জমা খারিজ ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৪৮-৪৯
২.৫ খাস জমি ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৪৯-৫০
২.৬ জলমহাল, চিংড়িমহাল, পাথরমহাল, বালুমহাল ও চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৫০-৫১
২.৭ অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৫১-৫২
২.৮ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৫৩-৫৪
২.৯ ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৫৪-৫৫
২.১০ আদিবাসীদের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন	৫৫-৫৬
২.১১ ম্যানুয়াল ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ও ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা	৫৬-৫৭
৩. অধ্যায় পরিশেষ	৫৭
অধ্যায় ৫ঃ তথ্য বিশ্লেষণ এবং আলোচনা	
১. সূচনা	৫৮

Dhaka University Institutional Repository

২. ভূমি আইনের বিবর্তনের প্রভাব ও বিদ্যমান জটিলতাসমূহ	৫৮
২.১ প্রাচীন ও অস্পষ্ট আইন	৫৮-৫৯
২.২ ভূমি মালিকানায় অসম বণ্টন	৫৯-৬০
২.৩ কৃষক বর্গাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি	৬০
২.৪ ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি	৬০-৬১
২.৫ ভূমি সংস্কার সফল্ভাবে না হওয়া	৬১
২.৬ সাধারণ জনগণের ভূমি আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা	৬২
৩. ভূমি প্রশাসনের বিবর্তনের প্রভাব ও বিদ্যমান জটিলতাসমূহ	৬২
৩.১ স্বতন্ত্র ভূমি প্রশাসন গড়ে না উঠা	৬২
৩.২ ভূমি প্রশাসনে সমন্বয়ের অভাব	৬৩
৩.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি	৬৩-৬৪
৩.৪ মানুষের দ্রুত সেবা প্রদানে জটিলতা	৬৪
৪. ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রভাব ও বিদ্যমান জটিলতাসমূহ:	৬৪
৪.১ সহজ ও দ্রুত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অভাব	৬৪-৬৫
৪.২ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান	৬৫
৪.৩ অদক্ষ লোকবল ও যন্ত্রপাতির অভাব	৬৫
৪.৪ স্থানীয় ভূমি প্রশাসনের ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপ প্রয়োগ	৬৬
৪.৫ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় অপরিকল্পনা	৬৬
৫. ভূমি ব্যবস্থায় এসব জটিলতা বিদ্যমান থাকার কারণসমূহ	৬৭
৫.১ রাজনৈতিক কারণ	৬৭-৬৮
৫.২ প্রশাসনিক কারণ	৬৮
৫.৩ অর্থনৈতিক কারণ	৬৮-৬৯
৫.৪ সামাজিক কারণ	৬৮
৬. অধ্যায় পরিশেষ	৬৯
অধ্যায় ৬ঃ সুপারিশ ও উপসংহার	
১. সূচনা	৭০
২. জটিলতা থেকে উত্তরণের সুপারিশ	৭০-৭১
৩. উপসংহার	৭২
তথ্যসূত্র	৭৩-৭৮
সাক্ষাৎকার	৭৯

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১

ভূমিকা

১. সূচনা

সারা বিশ্বে ভূমির অপরিহার্যতার কারণে এক স্পর্শকাতর সম্পদ হিসেবে ভূমিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাঙালি সমাজ ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভিত্তি হল ভূমি। ঐতিহাসিকভাবে, ভূমি আমাদের জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ভূমিই উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। সুদূর অতীতকাল হতেই এদেশে ভূমি সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে মানুষ কৃষি আবাদের জন্য ভূমি ব্যবহার শুরু করলেও কালক্রমে ভূমির দখলাধিকার নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়। সংবিধানের ৪২ (১) ধারায় বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, নিয়ন্ত্রণ ও স্থানান্তর করার অধিকার এর কথা উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার অসমতা সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও মৌলিক নীতির পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে (Hasan, 2017) । ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ঔপনিবেশিক আমল থেকেই ভূমি ব্যবস্থাকে সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আইন নেয়া হয়েছিল (ভূঞা,২০০৪)। সময়ের পরিক্রমায় এই আইনগুলো সংশোধিত হয়েছে এবং কিছু কিছু আইন বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার এদেশে মোট ভূমির পরিমান ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর যার মধ্যে ৬০ শতাংশ কৃষি জমি (বারাকাত , ২০১৬)। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অনুপাতে ভূমির পরিমান সীমিত হওয়ায় এদেশে ভূমিহীনতা একটি জটিল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ভূমিহীনতার পিছনে জটিল ও দুর্বোধ্য ভূমি আইনের প্রভাব রয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের ভূমি আইন দ্বারাই বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এদেশের ভূমি আইনগুলো সুসজ্জিত নয় এবং ভূমির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বিস্তৃত ভূমি আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের অভাব রয়েছে (Billah, 2017)।

বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপ্রতুল ভূমি বিদ্যমান। যার প্রতিশ্রুতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এই অপ্রতুল ভূমি ব্যবস্থাপনা করা অত্যন্ত জরুরি। ভূমির অর্থনৈতিক মানদণ্ডের কারণে এটি আঞ্চলিক, জাতীয়, স্থানীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংঘাতের কারণ হয়ে থাকে। শহর ও গ্রামে মানব বসতির চলমান উন্নয়ন এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয় নিশ্চিতের লক্ষ্যে ভূমি প্রশাসনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ পূর্বাবশ্যক। মূলত শান্তিপূর্ণ সমাজ ও চলমান উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হল ভূমি প্রশাসন (Islam, 2013)। ভূমি ব্যবস্থাকে উন্নত

Dhaka University Institutional Repository

করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ও দক্ষ ভূমি প্রশাসন অত্যাবশ্যকীয়। সুষ্ঠু ও কার্যকরী ভূমি প্রশাসন ছাড়া ভূমি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০৪১ পূরণের লক্ষ্যে ভূমির টেকসই উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য ভূমি ব্যবস্থায় ভূমি আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ও যথাযথ ভূমি ব্যবস্থাপনা জরুরী। তবে ভূমি আইনের সুস্পষ্টতা ও বোধগম্যতার অভাব ভূমি ব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়ন বাস্তবায়নে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সাধারণ মানুষের ভূমি চাহিদাকেন্দ্রিক ভূমি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। ভূমি আইনের জটিলতা এখনো ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা এবং এই বিবর্তনের পরেও ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতাসমূহ বিদ্যমান থাকার পিছনে ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা। কেননা ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ ও কার্যকরী কাঠামোর অভাব এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ভূমি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে । এছাড়া বর্তমানে ভূমি প্রশাসনের কিছু অসৎ কর্মচারীর মাধ্যমে ভূমিদস্যুরা নকল দলিল প্রস্তুত করে এবং গরীব ও অসহায় মানুষের নতুন সৃষ্ট জমিতে বাহুজোরে দখল করে। ভূমি আইনের অস্পষ্টতা ও ভূমি প্রশাসনের কার্যকরী তদারকির অভাবের কারণে ভূমিদস্যুদের নিকট থেকে এসব দখলকৃত জমি ফেরত পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ও কঠিন হয়ে পরেছে (Alim, 2009) । এর ফলে ভূমি মালিকানায় ও বন্টণে অসমতা এবং নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাত পরিলিক্ষিত হয় । এসকল সমস্যাবলীর অস্তিত্ব থাকার পিছনে ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তণের প্রভাব ও এর ক্রমবিকাশ কতটুকু এসব সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে তা নির্ণয়ের জন্য এ গবেষণার প্রয়োজন।

২. পটভূমি

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস মূলত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন: আদিযুগ, হিন্দু আমল,বৃটিশ আমল, বর্তমান আমল (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল)। আদিযুগে সর্দার প্রথা প্রচলিত ছিল। সর্দার নতুন এলাকায় যাওয়ার পর বসতি স্থাপনকালে চাষাবাদের জন্য জমি ভাগ করে দিত। হিন্দু আমলে যে ব্যক্তি বা পরিবার জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষাবাদ করত তারাই ভূমির দখলদার মালিক হত। আদিযুগে ভূমির মধ্যস্বত্বভোগীর জন্ম না হলেও হিন্দু আমলে এদের গোড়াপত্তন হয়। প্রাচীন হিন্দু শাসন আমলে রাজা জমির মালিকানা দাবি করতেন না। তবে জমির মালিক চাষীর অবহেলার কারণে ভূমির ক্ষতি হলে রাজদণ্ড হিসেবে রাজাকে নির্ধারিত রাজস্বের দশগুণ ফসল জরিমানা দিতে হত (হক, ২০১৬)। মুসলিম আমলের সূচনা হয় ১২০১ সনে যখন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে। ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসনভার মুসলমানদের হাতে ছিল এবং জমিদারি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথা এ আমলেই প্রবর্তিত হয়। ১৫৪০-১৫৪৫ সাল পর্যন্ত আফগান শূর বংশীয় শাসক শেরশাহ সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে তার উজির টোডর মলের সহযোগিতায় ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে ভূমির সার্বজনীন মানসম্মত মাপ ও জরিপ প্রচলন করা হয়। আকবরের সময়ে ভূমি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে দেওয়ানী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম বার্ষিক মাত্র ২৬ লক্ষ টাকার রাজস্বের বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার ফলে বাংলায় বৃটিশ শাসনের সূচনা ঘটে। ইংরেজরা ১৭৬৯ সালে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যেক পরগনায় একজন ইংরেজ রেভিনিউ সুপারভাইজার নিয়োগ করে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচশালা বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রচলন করে। পরে ১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন এবং এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার ১৮৮৫ সনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এর নেতৃত্বে ল্যান্ড রেভেনিউ কমিশন গঠন করা হয় যা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পূর্বেই প্রাদেশিক পরিষদে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে (গাঙ্গুলী, ২০১২)।

বর্তমান আমল শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত বিল ১৯৫০ সনে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিস্তারিত আলোচনার পর পাস করে আইনে পরিণত করার মাধ্যমে। ১৯৫০ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রন ও কার্য পরিধি অনেকগুনে বৃদ্ধি পায়। এই আইনের ফলে পরিবার প্রতি ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় ৩৭৫ বিঘা। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ৯৮ জারি করা হয় যা পরিবার প্রতি ভূমি সীমা নির্ধারণ করা ১০০ বিঘা এবং ১০০ বিঘার অতিরিক্ত ভূমি সরকার বরাবরে সমর্পন করার আদেশ হয়। পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারি করা হয় এবং পরিবারপ্রতি ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় ৬০ বিঘা। এই অধ্যাদেশ বর্তমানে বহাল আছে এবং এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ১-৭-৮৭ইং তারিখে খাস জমি বণ্টন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। পরবর্তীতে এই নীতিমালা বাতিল করে ১৯৯৫ সালে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা জারি করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা জারি করা হয়। বর্তমানে এই নীতিমালা দুইটির বিধান মোতাবেক কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমান সরকার ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করার উদ্যোগ নিয়েছেন যার ফলে দ্রুত জনগণের কাছে সেবা প্রদান সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তণের কারণসমূহ ও ভূমি ব্যবস্থায় বিদ্যমান জটিলতাসমূহকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থার পটভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে (ইসলাম, ২০১৩)।

৩. সমস্যার বিবরণী

ভূমি ব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে যা বিভিন্ন যুগে ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে উদ্ভব হয়েছে। ভুমি ব্যবস্থায় যে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে তা ভূমির বিভিন্ন উপাদানে কার্যকরী সুফল প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি । ভূমি আইন, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অনিয়ম ও জটিলতা রয়েছে যেগুলো জনগণের ভূমি সেবা প্রদানে ব্যঘাত ঘটায়। ভূমি ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাবলী নিম্নে দেয়া হল:

- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু ভূমির ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ভূমিহীন জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ভূমি ব্যবস্থাপনা একটি জটিল প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে সঠিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অভাবে। ভূমির আইনী কাঠামোর সমস্যার কারণে ভূমিসেবা সহজে ও দ্রুততার সাথে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।
- সাধারণ জনগন ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি আইন সম্পর্কে অবগত না হওয়ার ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং মধ্যস্থ ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং সুষ্ঠু সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়।
- স্বাধীনতার পর বিভিন্ন ভূমি সংস্কার আইন নেয়া হলেও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও দুর্বল প্রশাসনের ফলে ভূমি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় এখনও জটিলতা রয়েছে।

৪. গবেষণার তাৎপর্য

পাকিস্তান আমল ও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হলেও ভূমি ব্যবস্থায় কোন সফলতা আসেনি। ভূমি প্রশাসনও ভূমি ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। দীর্ঘদিন ধরে ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমি আইন, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা পর্যালোচনা করার জন্য এই গবেষণা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পরেছে। ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা এখনও সাধারণ মানুষের কাছে জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। এছাড়া, ভূমি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আমলে ভূমি প্রশাসন এর কাঠামো পরিবর্তন হলেও প্রশাসনিক জটিলতার অবসান ঘটেনি। ভূমি প্রশাসনের জটিলতা বিদ্যমান থাকায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। তাই ভূমি আইন, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন জনগণের ভূমি সংক্রান্ত সেবায় কিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং তা ভূমি ব্যবস্থার বিদ্যমান জটিলতার অবসান ঘটিয়েছে কিনা তা জানার জন্য এ গবেষণাটির অতি প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. গবেষণার উদ্দেশ্য

- ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতার কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা তা সম্পর্কে জানা।

৬. গবেষণার প্রশ্ন

- ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন আমলে কী কী পরিবর্তন এসেছে?
- ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতার কী কোন পরিবর্তন ঘটেছে?
- ভূমি ব্যবস্থায় বিদ্যমান জটিলতাসমূহের কারণগুলো কী কী?

৭. গবেষণা পদ্ধতি

সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় (আহমেদ,১৯৯২)। গবেষণা ডিজাইন/প্রকৃতি তিন ধরনের হয়ে থাকে যেমনঃ গুণগত, পরিমানগত এবং মিশ্র গবেষণা (Creswell, 2009)। এ গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Research Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে। এতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা পদ্ধতি (Content Analysis Research Method) এবং বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Research Method) ব্যবহার করে ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তণের সার্বিক দিকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা পদ্ধতি কোন তথ্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রতিবেদন, চিত্রকলা প্রভৃতি উপাত্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থার উপাদানগুলো চিহ্নিত করে সেসকল উপাদানে বিভিন্ন আমলে যে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে তা গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যদিকে বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতিতে কোন সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং মূল কথাটি সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়। এ পদ্ধতি মূলত ভূমি ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানে যেসব জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর প্রকৃতি ও কারণ খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক উপাত্ত (Primary Data) এবং মাধ্যমিক উপাত্ত (Secondary Data) উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার KIIs (Key Informant Interviews) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার নেয়ার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত (Unstructured) এবং মুক্ত প্রশ্ন (Open-ended) পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের মধ্য থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling)

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার উত্তরদাতা (Respondents) হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। নমুনায়ন সাইজ হিসেবে ১৫ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে যার মধ্যে ভূমি আইনের বিশেষজ্ঞ ৩ জন শিক্ষাবিদ, ৩ জন ভূমি প্রশাসনের সাথে জড়িত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ৩ জন ভূমি সম্পর্কিত এনজিও সংস্থার প্রধান ও কর্মকর্তা, ৩ জন ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ৩ জন ভূমির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষক। গবেষণার তথ্যসমূহের বিশ্লেষণসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উপাত্তের তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটিতে তথ্য ও উপাত্তের সহায়ক হিসেবে গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল নিবন্ধ, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন এর প্রতিবেদনসমূহকে নির্বাচন ও অধ্যয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য ইন্টারনেটের নানাবিধ ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে অধিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে।

৮. সাহিত্য পর্যালোচনা

ভূমি প্রশাসন,ভূমি আইন, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বর্তমান বিভিন্ন সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তন এবং এর ফলে ভূমি ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাবলীর অবসান ঘটেছে কিনা সে সম্পর্কে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। হাসান (২০১৭) তার প্রবন্ধে " Land Administration in Bangladesh: Problems and Analytical approach to solution" বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ প্রবন্ধে ভূমি ব্যবস্থার বিশেষ করে ভূমি প্রশাসন এর সার্বিক সমস্যা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা বৃটিশ আমলের সনাতন ও প্রাচীন আইন ও রেগুলেশনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে যা ভূমি ব্যবস্থাকে অকার্যকর ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছে। এছাড়া ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলে সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। ভূমির খতিয়ান বা রেকর্ড অব রাইটস এর কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট এর সংখ্যাধিক্য ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রধান সমস্যা। কারণ কোনো একটি জমির মালিকানার কাগজ বা প্রমাণ কেউ তহসিল অফিস থেকে, কেউ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে এবং কেউ সেটেলম্যান্ট অফিস থেকে নিয়ে আসলে এবং কাগজে ভিন্নতা থাকলে কে আসল মালিক তা নির্ধারণ করা একজন জজের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রেকর্ড সংরক্ষণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালি করা হয়েছে যা ভূমি সেবা প্রদানে যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাঁধা সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত সকল তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রদান করতে পারছে না সমন্বয়হীনতা ও

Dhaka University Institutional Repository

অকার্যকারিতার কারণে । অপর্যাপ্ত এবং যথাযথহীন ভূমি রেজিস্ট্রেশন ভূমি ভোগদখল এবং ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। ভূমি সেবার ক্ষেত্রে নামজারিতে জনগণকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং নামজারিতেই ঘুষ ও দুর্নীতি বেশি সংঘটিত হয়। জাতীয় ভূমি রাজস্ব বোর্ড যথাযথ সময়ে নামজারি করে না বলে দ্বৈত মালিকানার সৃষ্টি হয়। প্রভাবশালী ও ধনী লোকদের দ্বারা ভূমি দখল আরও একটি বড় সমস্যা ভূমি ব্যবস্থায়। অর্পিত সম্পত্তি ও খাস জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও নানা অনিয়ম ও অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার আরো একটি প্রধান সমস্যা হল ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে বিশেষ করে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে। ভূমি নিয়ে দ্বন্দ্ব বা মামলা মোকদ্দমা ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসুত্রিতা ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আরও জটিল ও ভূমি সেবা প্রদানে ভোগান্তির সৃষ্টি করেছে (Hasan, 2017)। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন সরকারের ভূমি সেবা প্রদানে প্রণীত নীতিমালার অভাব ও ভূমি আইন ও ভূমি সংস্কার এর ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি।

Hossain (2015) “Improving Land Administration and Management in Bangladesh” শীর্ষক রিপোর্টে বলেছেন, বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জ হল ভূমি অধিগত করার ক্ষমতা এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা পরিকল্পিত ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থার বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলার জন্য একটি কার্যকরী ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা দরকার। বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যায়ে ৮০ ভাগ মামলাই ভূমি নিয়ে দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত মামলা যা বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনার কারণে হয়েছে। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা জটিল প্রক্রিয়া। ভূমি মালিকানার রেকর্ড ভূমির মালিক ও প্রতিবেশীদের জরিপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সেটেলম্যান্ট অফিস জরিপের ফলাফল নিশ্চিত করে ও এগুলো খতিয়ানের মাধ্যমে রেকর্ড করে। জরিপ দশ বছরের অধিক সময় ধরে হয়ে থাকে। জরিপের মাধ্যমে সঠিক সময়ে জমির আসল মালিক বোঝা কঠিন। জটিল ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা ছাড়াও ভূমির পরিবর্তনের হার কৃষি জমিকে অকৃষি (বাড়িঘর ও ব্যবসা) উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চাপ বেড়েছে (Hossain, 2015)। আলী (২০০২) তার “বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থা এবং রাজনীতি” শীর্ষক গ্রন্থে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন সরকারের আমলে ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার সাহায্য ও পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটার পর ১৯৭৪ সালে একটি ভূমিকর কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। যদিও এটি ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করেনি শুধু বিশিষ্ট কার্যক্রমগুলোই সমাধা করেছে। ১৯৭৫ সালের পর জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে (১৯৭৫-৮২) স্বেচ্ছাশ্রমের সাহায্যে খাল খননের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপের প্রবর্তন করে তবে ভূমি পদ্ধতি সংস্কারের ব্যাপারে কিছুই করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের ভূমি সংস্কার কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং কৃষি মজুর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সুপারিশ করা হয়েছিল। এই ভূমি সংস্কার পদক্ষেপে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমার ওপর। তবে এই ভূমির সর্বোচ্চ সীমা কার্যকর হয় শুধুমাত্র ২০ একর এর কম জমির মালিকদের ক্ষেত্রে (আলী, ২০০২)।

ভূঞা (২০০৪) তার "যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা " বইয়ে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের প্রণীত আইন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি প্রশাসন, ভুমি ব্যবস্থায় সংস্কার ও জরিপ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে, পৃথিবীর অগণিত জাতিসত্ত্বার বাংলাদেশের ভূমির প্রতি আকর্ষণ ইতিহাসে বিরল। এই ভূমির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বর্তমানে এর উপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশের ভূমি ছিল উর্বর এবং মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ গোষ্ঠিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা এবং পরবর্তীতে কৌমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় গ্রাম প্রধান দ্বারা স্থানীয় ভূমি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত। কালক্রমে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্তরে স্তরে সামন্তপ্রথা গড়ে উঠে। মুসলিম শাসনামলে এদেশের বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থার সাথে আরব পারস্য ধারার উন্নততর ভূমি ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো হয়। পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনামলে জমিদারী প্রথার ফলে চাষিরা ভূমির মালিকানার অধিকার হারিয়ে জমিদারের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণত হয়। তবে, বৃটিশ শাসনামলের পর পাকিস্তান আমলে জমিদারি উচ্ছেদ পূর্বক চাষি প্রজাকে ভূমির মালিকানা ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু গ্রাম বাংলা হতে জমিদার বিদায় নিলেও তার স্থলে আবির্ভাব ঘটে জোতদারের। জোতদারের হাতে ভূমি সঞ্চিত হতে থাকে সুষম ভূমি বণ্টনের স্থলে। ভূমিহীনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন জরিপ কার্যক্রম হলেও বর্গাচাষি ভূমি মালিকানা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৮৪ সালে তেভাগা ব্যবস্থার বিধান করা হলেও আধিবর্গা ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়ে গেছে। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব ঋণ সুবিধা প্রদান, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন, কৃষি সামগ্রীর সুলভ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ সার্বিকভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সুবিধার্থে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি সম্পদ জোতদারদের হাতে স্থানান্তর রোধ করা (ভূঞা , ২০০৪) । হক (২০১৬) তার "ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে বৃটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত ভূমি আইন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে। তিনি এই গ্রন্থে বৃটিশ আমলে পর জোতদারদের কবল থেকে ভূমিকে রক্ষা না করার পিছনে সাফল্যজনকভাবে ভূমি জরিপ এবং দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে না তোলাকে আখ্যায়িত করেছেন। ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের বঞ্চিত করে এই জোতদার শ্রেণিকে সহায়তা করে ভূমি প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ। ভূমি প্রশাসন ও ভূমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধন করার জন্য পৃথক কর্তৃপক্ষ চালু থাকায় ও দখল স্বত্ববিহীন ব্যক্তিগন কর্তৃক ভূমি নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থতার ফলে ভূমি বিরোধ জনিত দাঙ্গাহাঙ্গামা ও মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশর ভূমি আইন ও ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তার মতে, সুষ্ঠুভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে ভূমিস্বত্ব নির্ধারণ করে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধন করা এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে একই কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হলে এবং উদ্বৃত্ত খাস জমি উদ্ধার, পয়স্থি ও চর ভূমি ত্বরিত জরিপ করে তা চিহ্নিত করে তা প্রকৃত ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের নিকট বন্দোবস্ত দেওয়া হলে এবং বর্গা চাষিদের স্বার্থ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হলে দেশে কৃষি উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকৃত চাষিদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে বলে আশা করা যায় (হক , ২০১৬)।

বারাকাত (২০০৪) তার গ্রন্থ " বাংলাদেশে ভূমি-মামলার রাজনৈতিক-অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা" এ ভূমি মামলায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কি ধরনের ভোগান্তির স্বীকার হয় বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে এবং এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রশাসন ও রাজনীতি কিভাবে কাজ করছে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমি মামলা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে যে ক্ষতি করছে সেটার মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব কিভাবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভূমি অধিকার সম্পর্কিত সংগঠন, নাগরিক সমাজ ও সরকারের করণীয় সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের ভূমি আইনের জটিলতা ও অসঙ্গতি এবং সাধারণ মানুষের ভূমি আইন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের পাশাপাশি আইনের প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনার সমস্যাকে সাধারণ মানুষের ভূমি সেবা গ্রহণে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখেছেন। ভূমি মামলায় জটিলতা এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তির প্রশমনের জন্য সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন যথা: ক) ভূমি আইন ও প্রশাসন খ) সম্পূর্ণ বিচার-আইন ব্যবস্থা গ) প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট খাত ও ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা (বারকাত, ২০০৪)। Billah (2017) তার পি.এইচ.ডি থিসিস "The Politics of Land Law: Poverty and Land Legislation in Bangladesh" এ উপনিবেশিক আমল এবং উপনিবেশিক এর পরবর্তী সময়ে সকল ভূমি আইনের সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের কৃষকদের দরিদ্রতার হার বৃদ্ধির পিছনে। ভূমি আইনের সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি রাজনৈতিক ইচ্ছা ও প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতাকে দায়ী করেছেন কৃষকদের অবস্থার অবনতির জন্য । মূলত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমি আইনগুলো সংশোধিত হয়েছে বা বিলুপ্ত করা হয়েছে যা ভূমি সম্বন্ধীয় কার্য সম্পর্কে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। এটা প্রতীয়মান হয় যে ভূমি আইনগুলো রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সাময়িক প্রতিক্রিয়া অনুসারে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যা জটিলতা, অস্পষ্টতা ও ইচ্ছাধীনতায় পরিপূর্ণ ছিল। এছাড়া ভূমি আইনের মাধ্যমে দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হয়নি যা ভূমি সংস্কারকে বাস্তবায়ন করবে (Billah, 2017)।

৯. ধারনাগত কাঠামো

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণার ধারনাগত কাঠামোয় মূলত ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থা এবং ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনকে বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত উপাদান ও এর বিবর্তনকেও বিশেষায়িত করা হয়েছে। নিম্নে ধারনাগত কাঠামোর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে:

৯.১ ভূমি

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ২(১৬) ধারা অনুসারে ভূমি বলতে চাষ করা হয়, চাষ করা হয় না অথবা বছরের কোনো সময় জলমগ্ন থাকে এরূপ জমি এবং উহা হতে উৎপন্ন লাভকে বুঝায়। বাড়ি ঘর, দালান-কোঠা, মাটির সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য জিনিস বা মাটির সঙ্গে সংযুক্ত কোনো জিনিসের সঙ্গে স্থায়ীভাবে আটকানো জিনিস ভূমির অন্তর্গত (রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০)।

৯.২ ভূমি ব্যবস্থা

সাধারণত ভূমি ব্যবস্থা বলতে ভূমির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের উপাদান জড়িত যেমন: ভূমি শাসন বা পরিচালনা, ভূমি নীতি, ভূমি আইন, ভূমি প্রশাসন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন ইত্যাদিকে নির্দেশ করে (Masum, 2017)। এই গবেষণায় ভূমি ব্যবস্থা বলতে ভূমির সাথে সম্পর্কিত ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। এনমার্ক (২০০৬) ধারনাগতভাবে ভূমি ব্যবস্থাকে কয়েকটি স্তরের পর্যায়ে ভাগ করেছেন যেমন: ভূমি আইন বা নীতি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা, ক্যাডাস্ট্রে, ভূমি অংশ। ভূমি আইন বা নীতি ভূমিকে মূল সম্পদ হিসেবে ভূমির মূল্য, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার আইনী কাঠামো নির্ধারণ করে। ভূমি ব্যবস্থাপনা ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে সকল কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলো ভূমি প্রশাসনের মূল কার্যবলীকে নির্দেশ করে যেমন: ভূমির মেয়াদ বা ভোগদখল, ভূমির মূল্য, ভূমি ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা ভূমি নীতি বাস্তবায়ন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল, এবং দক্ষ জমির বাজার পরিচালনা ও কার্যকরী ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো প্রদান করে। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার মূলে রয়েছে কাডাস্ট্রে। কাডাস্ট্রে হালনাগাদ করা ভূমির জরিপের ভূমি ম্যাপ অনুযায়ী প্রত্যেক ভূমি অংশের স্থান-সংক্রান্ত অখণ্ডতা এবং অনন্য সনাক্তকরণ প্রদান করে। ভূমি অংশের সনাক্তকরণ ভূমিতে অধিকার নিশ্চিতে এবং ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সংযোগ প্রদান করে। ভূমি অংশ ভূমি অধিকারের সনাক্তকরণ এবং ভূমি ব্যবহারের বিধি-নিষেধ ও দায়িত্ব সম্পর্কে মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। ভূমি অংশই সাধারণত ভূমি ব্যবস্থা ও মানুষের মধ্যে সংযোগ প্রদান করে (Enemark, 2006)।

Dhaka University Institutional Repository

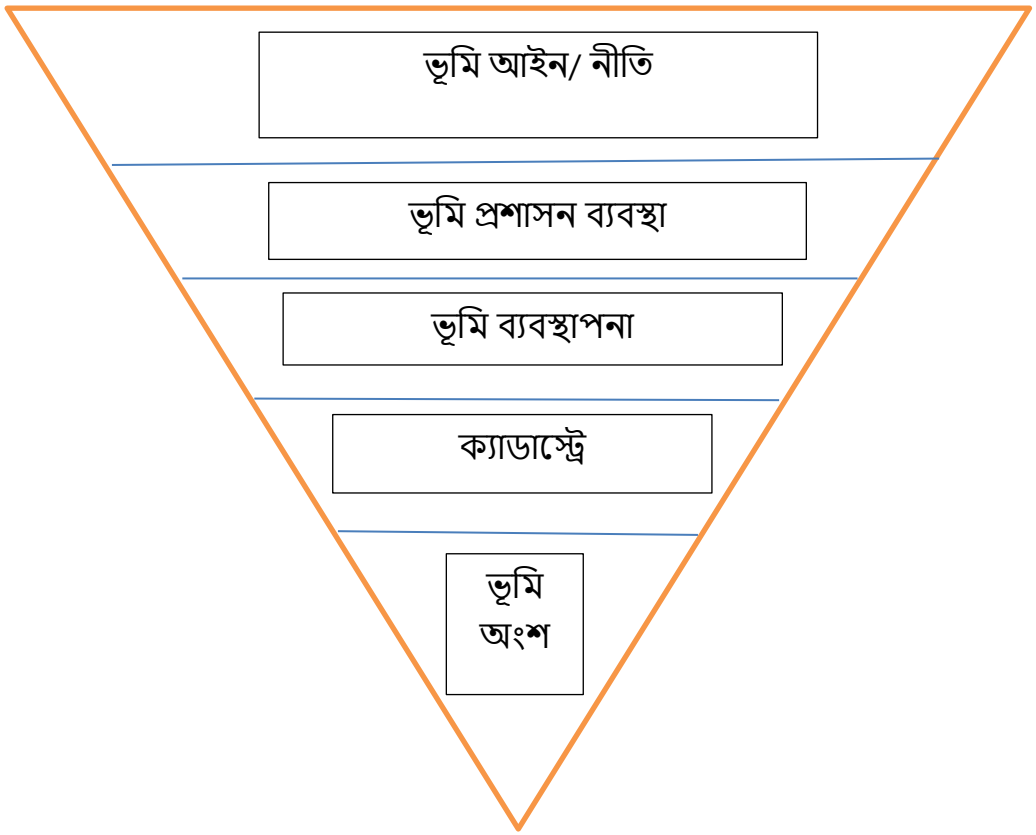

চিত্রঃ সমাজে ভূমি ব্যবস্থা সূত্রঃ Enemark, 2006

এনমার্কের সমাজে ভূমি ব্যবস্থার কাঠামোগত আলোচনা থেকে ভূমি ব্যবস্থার মূল উপাদান হিসেবে ভূমি আইন, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে বিবেচনা করা হয়েছে এ গবেষণায়।

৯.৩ ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন

ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন বলতে ভূমি ব্যবস্থার সকল উপাদানে যে পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝায়। মূলত ভূমির সাথে সম্পর্কিত ভূমি আইন, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় কালক্রমে যে বিবর্তন ঘটেছে তা নির্দেশ করে। প্রাচীনকাল থেকেই ভূমি নিয়ে নানা ধরনের জটিলতা আত্মকলহ, ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা , সালিশ বিচার, মামলা মোকদ্দমা, যুদ্ধ, বিগ্রহ, নানা সংগ্রাম ও আন্দোলন হয়েছে। এ সকল জটিলতার কারণে ই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে।

৯.৩.১ ভূমি আইন ব্যবস্থা ও বিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি ব্যবস্থার একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে ভূমি আইনকে বিবেচনা করা হয়। কারণ ভূমি আইন ব্যতীত ভূমি ব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নয়। সে প্রাচীন আমল থেকেই ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রবর্তিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে ভূমি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন হয়েছে। ভূমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা,ভূমি অধিকার, ভূমি হস্তান্তর, কৃষক ও জমিদার/সরকারের মধ্যকার সম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে। তবে বাংলাদেশের ভূমি আইনগুলো জটিল, অস্পষ্ট ও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়া প্রচলিত আইনগুলোর কাঠামো মূলত ঔপনিবেশিক ধারনা দ্বারাই গভীরভাবে সংযুক্ত। বিভিন্ন আমলের ভূমি আইনে কাঠামোগত সমস্যা, আদর্শিক অপূর্ণতার কারণে ভূমি সংস্কার প্রচেষ্টা সফলভাবে কার্যকর হয়নি (Billah, 2017)। ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের মধ্যে ভূমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তন বিভিন্ন আমলে ভূমি মালিকানা, অধিকার, স্থানান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনলেও, ভূমি সেবা প্রদানে ভূমি আইনের জটিলতা এখনো বিদ্যমান।

৯.৩.২ ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা ও বিবর্তন

ভূমি প্রশাসন ভূমি ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভূমি ব্যবস্থাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন আমলে। এই প্রশাসনিক কাঠামো মূলত ভূমিতে রাজস্ব আদায়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে ভূমি ব্যবস্থার বিস্তৃতির সাথে ভূমির প্রশাসনিক কাঠামোরও বিস্তৃতে ঘটেছে। ভূমি প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিবর্তন বলতে ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন আমলে প্রশাসনিক যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বোঝানো হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকেই প্রশাসনিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভূমি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অধিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে (মজুমদার, ১৯৯৪)। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা মূলত ভূমি ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যাবলীর ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। তবে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র প্রশাসন ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি । ফলশ্রুতিতে ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে।

৯.৩.৩ ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও বিবর্তন

ভূমি ব্যবস্থার অন্যতম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভূমি ব্যবস্থাপনা। ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যতীত ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। ভূমি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ভূমির সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। ভূমি ব্যবস্থার সাথে ভূমি আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থার মতো ব্যবস্থাপনার ও জোড়ালো সম্পর্ক রয়েছে। ভূমি ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে ভূমি আইন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর। ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে ভূমির পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে ভূমি সম্পদের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল কার্যাবলীকে বোঝায় (Enemark, 2009)। ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন বলতে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা

Dhaka University Institutional Repository

কার্যাবলীতে বিভিন্ন আমলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বুঝানো হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকে ভূমির অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে ভূমি কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে ভূমির পরিবেশগত দিক ও বিবেচনা করে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

১০. এক নজরে ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস

১৭৫৭ পূর্ব

১৭৫৭ সাল পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিহত হন।

১৭৬৪ সাল বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পূর্ণ ক্ষমতা দখল।

১৭৬৫ সাল কোম্পানির দেওয়ানী লাভ।

১৭৬৯ সাল খাজনা আদায় তদারকী করার জন্য ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগ।

১৭৭০ সাল বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

১৭৭২ সাল প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন।

১৭৯৩ সাল লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু করেন।

১৮২৫ সাল বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন ডিলুভিয়ন রেগুলেশন জারি।

১৮৪৭ সাল বঙ্গীয় সিকস্থি পয়স্থি আইন ঘোষণা।

১৮৫৯ সাল বেঙ্গল রেন্ট অ্যাক্ট পাশ হয়।

১৮৭৫ সাল বেঙ্গল সার্ভে আইন পাশ হয়।

১৮৭৯ সাল রেন্ট কমিশন গঠন করা হয়।

১৮৮৪ সাল ভূমি রেকর্ড পরিদপ্তর গঠন ও চালু।

১৮৮৫ সাল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।

১৮৯০ সাল বাংলার প্রথম নকশা প্রণয়নের জন্য সি.এস জরিপ শুরু হয়।

১৯২০ সাল বঙ্গীয় পয়স্থি আইন জারি।

১৯৩৬ সাল সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।

১৯৩৮ সাল বেঙ্গল ল্যান্ড রেভেনিউ কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন গঠন হয়।

১৯৪৭ সাল বৃটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ সাল অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন পাশ।

১৯৫০ সাল রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করা হয়।

১৯৫৫ সাল প্রজাস্বত্ব বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করা হয়।

১৯৫৬ সাল এস.এ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৫৮ সাল গভার্নমেন্ট অ্যাস্টেট ম্যানুয়াল জারি।

১৯৬২ সাল ওয়াকফ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

১৯৬৩ সাল এস.এ জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত।

১৯৬৫ সাল এস.এ খতিয়ান সারাদেশে কার্যকর হওয়ায় ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন রহিত হয়।

১৯৬৫/৬৬ সাল এস.এ জরিপের ভুলত্রুটি নিরসনকল্পে বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় প্রথম সংশোধনী জরিপ কার্যক্রম চালু করা হয়। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় শত্রু সম্পত্তি আইন ঘোষণা করা হয়।

১৯৬৯ সাল কতিপয় বিষয় ব্যতীত শত্রু সম্পত্তি আইন রহিত হয়ে যায়।

১৯৭২ সাল পরিত্যাক্ত সম্পত্তি আইন জারি।

১৯৭২ সাল রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭২,৯৬,৯৮,১৩৫ এবং ১৩৭ দ্বারা ভূমি আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রদ-বদল হয়।

১৯৭৪ সাল শত্রু সম্পত্তি আইনকে অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে চালু ও বহাল করা হয়।

১৯৭৬ সাল ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি।

১৯৮০ সাল ভুমি প্রসাশন বোর্ড গঠন ও বাস্তবায়ন।

১৯৮২ সাল স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন জারি।

১৯৮৪ সাল ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি।

১৯৮৪/৮৫ সাল ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ প্রণয়ন ও জারি।

১৯৮৫-১৯৮৭ সাল উপজেলা ভিত্তিক ভূমি জরিপের স্থায়ী অফিস উপজেলা সেটেলম্যান্ট অফিস চালু।

১৯৮৭ সাল খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা জারি।

১৯৮৯ সাল ঋণ সালিশী অধ্যাদেশ জারি ও বাস্তবায়ন এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ জারি।

১৯৯০/৯১ সাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং গভর্নমেন্ট অ্যাস্টেট ম্যানুয়াল ১৯৫৮ বাতিল হয়।

১৯৯১ সাল ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ।

১৯৯৪ সাল সাগর/ নদী সিকস্থি আইনের সংশোধনী।

১৯৯৫ সাল অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা জারি।

২০০১ সাল জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা।

১১. অধ্যায় পরিশেষ

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সর্বমোট ৬ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় ভূমিকা অংশে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পটভূমি, সমস্যার বিবরণী, গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্ন, গবেষণার তাৎপর্য, গবেষণা পদ্ধতি, সাহিত্য পর্যালোচনা, ভূমির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান নিয়ে ধারনাগত কাঠামো এবং বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভূমি আইন ব্যবস্থার বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান আমল পর্যন্ত বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও ভূমি সম্পর্কিত কার্যাবলীর ওপর নির্ভর করে কিভাবে প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান আমল পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনায় যে বিবর্তন ঘটেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভূমি ব্যবস্থার বিদ্যমান জটিলতাকে নিরসনের লক্ষ্যে সুপারিশ ও উপসংহার তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে আরো বেশি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করলে গবেষণাটি আরো সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল হতো। সময় ও আর্থিক সংকটের কারণে এ গবেষণায় সাক্ষাৎকার উত্তরদাতার সংখ্যা সীমিত করা হয়েছে।

অধ্যায় ২

ভূমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তন

১. সূচনা

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ন উপাদান হল ভূমি আইন। ভূমি আইন মূলত ভূমিতে অধিকার বা মালিকানা সৃষ্টি করা, হস্তান্তর করা, পরিচালনা করা এবং ভূমি অধিকারের অবসান এবং ভূমি ব্যবহার ও উপভোগের বিষয়গুলিকে নিয়ে অধ্যয়ন করে থাকে (Billah, 2017)। বাংলাদেশের ভূমি আইনগুলো বৃটিশ আমল থেকেই প্রণীত হয়েছে। বৃটিশদের ও পাকিস্তান আমলের প্রণীত বিভিন্ন ভূমি আইন এখনও ভূমি ব্যবস্থায় প্রধান আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রাচীন আইনগুলো সাধারণ জনগণের নিকট সহজবোধ্য নয় এবং এগুলো ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন জটিলতাকে সৃষ্টি করছে (Islam, 2013)। এই জটিলতার ফলে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা এখনও সাধারণ মানুষের ভূমি সেবায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এ অধ্যায়ে বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের ভূমি ব্যবস্থার আইনগুলো কিভাবে ভূমি মালিকানা, ভূমি অধিকার, ভূমি হস্তান্তর, কৃষক ও জমিদার/সরকারের মধ্যকার সম্পর্কে পরিবর্তন এনেছে এবং ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টে ভূমি আইনের বিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশের ভুমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তনঃ

ভূমি আইনের বিবর্তন বা পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আমলে বিভিন্ন ভূমি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বৃটিশদের আগমনের পূর্বে ভূমি আইন নিয়ে বাংলার মানুষের কোন মাথাব্যথা ছিল না কারণ তখন ভূমিতে অধিকার ও মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়টি ছিল না। ভূমিতে মালিকানা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভূমি আইনেরও বিকাশ ঘটে। ভূমি আইন ব্যবস্থার বিভিন্ন আমলে যে বিবর্তন ঘটেছে তা বিভিন্নভাবে ভূমি মালিকানা, হস্তান্তর, স্থানান্তর ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তন এনেছে। বাংলাদেশের ভূমি আইন ব্যবস্থা ভূমি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদনে ব্যাপক প্রভাব বিরাজ করে। ভূমি আইন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূমি ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। নিম্নে ভূমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তনের পিছনে যে বিষয়গুলো মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে সেগুলো বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছেঃ

২.১ ভূমি মালিকানায় পরিবর্তন

ভূমি মালিকানা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন শাসনামলে ভূমি আইনগুলো ভূমি মালিকানায় নানা পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রাচীন যুগে মানুষ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য যেখানে বাস করত সেখানেই চাষাবাদ করে ফসল ফলাত। তখন রাজা বা সরকার ছিল না তবে সর্দার প্রথা ছিল। হিন্দুযুগে ভূমির মালিকানা সম্পর্কে মহামুনি মনু বলেন যে, "গ্রাম বাংলায় তাহারাই কৃষি ভূমির মালিক হইবে, যাহারা উহার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষাবাদ করার মাধ্যমে উক্ত রূপ জমিকে চাষাপযোগী করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে" (গাংগুলী, ২০১২)। ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করত কৌম সমাজ ও পরবর্তী পর্যায়ে গ্রাম সমাজ বা পঞ্চায়েত (হক, ২০১৬)।

তবে তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ রাজাকে প্রদান করে জমি ভোগ দখলে রাখার অধিকারী হত। মুসলিম শাসনামলে ও ভূমির মালিকগণ বংশানুক্রমিকভাবে ভূমির মালিকানা ভোগ দখল করতে থাকে। মুসলিম সম্রাট ও বাদশাহগণ প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করে ভূমি ব্যবস্থাপনা শুরু করে এবং ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে (দেবনাথ, ২০১০)। পলাশী পূর্ববর্তী আমলে ভূমি ব্যবস্থা মূলত ভূমি মালিকানা ও রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থাকেই বুঝাত। মোঘল পূর্ববর্তী আমলেও রাজারা ভূমির মালিক হিসেবে ছিল যদিও প্রজারা স্বাধীনতা ভোগ করত জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে (Billah, 2017)। মুসলিম শাসনামলের মোঘল আমলে জমিদারী প্রথা প্রবর্তিত হয়। জমিদারগণ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে খাজনা আদায় করত এবং আদায়কৃত খাজনার একটি আংশিক পরিমান ভোগ করতে পারত। এছাড়া ভূমির মালিকগণও বংশানুক্রমিকভাবে ভূমির মালিকানা ভোগ করতে পারত (দেবনাথ, ২০১০)। পরবর্তীতে, কৃষক চাষকৃত জমির দুই-তৃতীয়াংশ ভোগ করতে পারত এবং এক-তৃতীয়াংশ রাজ্যভাণ্ডারে জমা হত (Alim, 2009)। মুসলিম সম্রাট শেরশাহ কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রদানের মাধ্যমে ভূমির উপর কৃষকদের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে মালিকানা হস্তান্তরের নিশ্চয়তা প্রদান এবং উক্ত ভূমির জন্য দেয় খাজনার পরিমান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল (গাঙ্গুলী, ২০১২)। তবে মুসলিম আমলেও ভূমিতে মালিকানা বা স্বত্ব অধিকার নিয়ে কোন আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ছিল না। একই জমিতে বিভিন্ন মানুষের (রাষ্ট্র, জমিদার, কৃষক) বিভিন্নরকম অধিকার ছিল (Billah, 2017)।

২.১.১ বৃটিশ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন:

ব্রিটিশ আমলে ভূমি মালিকানায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসা হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে। বৃটিশ আমলের পূর্বে ভূমিতে মালিকানার অধিকার হিসেবে সবার মালিকানা বজায় ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রত্যেক জমিদার তার জমিদারি এলাকার সমস্ত জমির একচ্ছত্র মালিক হিসেবে মালিকানা পেয়েছিল (হক,২০১৬)। বৃটিশ আমলে প্রজাদের ভূমিতে মালিকানা স্থাপনের অন্যতম একটি পদক্ষেপ ছিল ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন। ঐ আইনে সর্বপ্রথম প্রজার জমি ও জমার বিবরণ ও তার স্বত্বের শর্তাবলি উল্লেখ করে প্রজাকে জমিদার প্রভৃতি ভূম্যাধিকারী কর্তৃক পাট্টা দেয়ার বিধান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিতে কোন রায়তের যদি এই আইন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব হতে কোনো আইনের বলে বা প্রথা বলে বা অন্য কোনোভাবে জমিতে দখলি স্বত্ব থাকত তাহলে এই আইন কার্যকর হওয়ার পর তাদের ঐ জমিতে দখলি স্বত্ব বহাল থাকার বিধান করা হয়েছিল। তবে ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী ১০/২০ বছরের স্থায়ী রায়তকে দখলি স্বত্বাধিকার বা মালিকানা প্রদান করা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। এই আইন অনুযায়ী জমির প্রকৃত মালিককে সঠিকভাবে মালিকানা প্রদান করা হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে বিপুল পরিমান জমি চলে যায়। এর মধ্যে

জমিদারশ্রেণি যেমন বহু জমি তার ব্যক্তিগত খামারভুক্ত করে নিয়েছিল তেমনি এসব জমি পত্তনি নিয়ে বহু জোতদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল (নওয়াজ, ২০১৪)।

২.১.২ ব্রিটিশ শাসনামলের অবসান ও পাকিস্তান আমলের আইন:

১৯৩০– এর দিকে জমিদারি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদের লক্ষ্যে 'লাঙল যার, জমি তার' আন্দোলন হয়েছিল। পরবর্তীতে ফজলুল হক ১৯৩৮ সালে জমিদারি উচ্ছেদের লক্ষ্যে ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল ফ্লাউড কমিশন। এ কমিটি ১৯৪০ সালে সিদ্ধান্তে আসে যে জমিদারি প্রথা এদেশের মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে এবং এখন তা পরিহার্য। ১৯৪০ এর দশকে অধিকাংশ রায়তই উচ্চশ্রেণির রায়তে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৯ এর প্রজাস্বত্ব আইনে সবাই জমির মালিকানা অর্জন করে। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ফলে জমিদারগণ সংশ্লিষ্ট ভূমিতে মালিকানা স্বত্ব হারায় এবং সে স্থলে ঐ জমির মালিকানা স্বত্ব সরকারের উপর বর্তায় (ভূঞা, ২০০৪)। এ আইনে চাকরানদের তাদের ভোগদখলীয় ভূমিতে রায়তি স্বত্ব বা মালিকানা দেয়া হয়। ১৯৫০-৫১ এর আইনের ভূমি মালিকানার উর্ধ্বতম সীমা ১০০ বিঘা বাতিল করে তা করা হয় ৩৭৫ বিঘা। ফলে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন সম্ভবপর হয়নি। ৩৭৫ বিঘার উপরে কেউ যদি উত্তরাধিকার সূত্রে জমি লাভ করে, তবে সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে উক্ত জমি নিতে পারবে এবং এই আইন ও ছিল জোতদারদের পক্ষেই (হক,২০১৬)।

২.১.৩ বাংলাদেশ আমলে ভূমি মালিকানার পরিবর্তনে আইনের প্রভাব:

বাংলাদেশ আমলে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৯৮-বাংলাদেশ ভূমি (সীমিতকরণ) আদেশ আইনের ৩ ধারায় পরিবার ভিত্তিক জমি মালিকানার উর্ধ্বসীমা ৩৭৫ বিঘা হতে কমিয়ে ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে কোন মালিক পরিবার বা সংস্থার জমি ১০০ বিঘার বেশি থাকলে সীমাতিরিক্ত জমি সরকারে সমর্পিত হবে বা কোন পরিবার বা সংস্থা এ তারিখের পর ক্রয় বা অন্য কোনভাবে ১০০ বিঘার বেশি জমি অর্জন করতে পারবে না। পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারী করা হয় এবং পরিবার প্রতি ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় ৬০ বিঘা (আলবেরুনী, ২০১৫)। তবে যাদের ১০০ বিঘা ভূমি আছে তাদের ১০০ বিঘা রাখার অধিকার বহাল রাখা হয় কিন্তু নতুন করে কোন পরিবারকে ৬০ বিঘার অধিক জমি অর্জন করতে এই আইন বাধা হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ বহাল আছে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য খাসজমি বণ্টন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয়। পরবর্তীকালে উক্ত নীতিমালা বাতিল করে ১৯৯৫ সালে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা জারী করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা জারী করা হয়। বর্তমানে এই নীতিমালা দুইটির বিধান মোতাবেক কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে বর্তমানে তিন ধরনের মালিকানা রয়েছে যেমন ক) রাষ্ট্র মালিকানা- জনগণের পক্ষে সরকার মালিকানা লাভ করে, খ) যৌথ মালিকানা- সকল সদস্য যৌথভাবে মালিকানা লাভ করে, গ) ব্যক্তিগত মালিকানা- ব্যক্তি যে মালিকানা লাভ করে (Hasnat et al., 2018)।

২.২ ভূমি হস্তান্তরের পরিবর্তন:

ভূমি হস্তান্তরকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রেও ভূমি আইনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর্যপূর্ব যুগে, ভূমির কোনো মালিকানা ছিল না বিধায় ভূমি হস্তান্তরেরও ব্যবস্থা ছিল না। তবে যদি কারও চাষাবাদের প্রয়োজন হয় তাহলে অন্যের অব্যবহৃত ও চাষহীন জমিতে চাষাবাদ করতে পারে। আর্যযুগে কেউ তার বরাদ্দকৃত জমি গ্রামের অন্য বাসিন্দাদের অনুমতি ব্যতীত অন্যের নিকট হস্তান্তর করতে পারত না (হক,২০১৬)। হিন্দু আমলে রাজাই সকল ভূমির মালিক ছিলেন এবং প্রজারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কোনো জমি ক্রয় করতে পারত না । মুসলিম আমলে, চাষি জমির মালিক ছিল এবং আইনত সে তা বিক্রয় বা অন্য যেকোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারতো খিলজি শাসনের সময়। মোঘল শাসনামলে, রায়ত বা মালিক বলতে সকল ধরনের কৃষককেই বুঝায়, তবে তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি বিদ্যমান ছিল যাদের অন্যের নিকট বিক্রি বা হস্তান্তরের অধিকার ছিল, যদিও সে অধিকার প্রয়োগের নিদর্শন বেশি দেখা যায়নি (Islam, 2013)। তবে, মোঘল আমলে কৃষক ইচ্ছে করলেই তার দখলি জমি অন্য কাউকে বিক্রি করতে পারতো না। কালের বিবর্তনে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ভূমি মালিকানা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হতে থাকে এবং ভূমি হস্তান্তরের সঠিকতা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। কালক্রমে বৃটিশ শাসনামলে দলিল নিবন্ধিকরণ সংক্রান্ত আইনের উদ্ভব ঘটে (হক, ২০১৬)।

২.২.১ ব্রিটিশ আমলের ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন:

বৃটিশ আমলে প্রজারা তাদের নিজস্ব জমি হস্তান্তর করতে পারত যদি তারা রাজস্ব কর সঠিকভাবে প্রদান করত। এ আমলে সর্বপ্রথম ১৭৮৯ সালে বঙ্গীয় বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে রেজিস্ট্রিকরণ আইন স্বীকৃতি লাভ করে যার মাধমে জমির দলিল রেজিস্ট্রি, জরিপ ও নামজারিকরণ করা হত (খান, ২০০৮) । পরবর্তীতে ১৭৯৩ সালের ৩৬ নং রেগুলেশনের মাধ্যমে উইল সম্পত্তির বন্ধকনামা বা হস্তান্তর পত্র রেজিস্ট্রিকরণ করা হত। ১৮৬৯ সালের খাজনা আইনে কোনো এলাকার প্রথা অনুযায়ী রায়ত তার দখলিস্বত্ব হস্তান্তর করতে পারলে দখলিস্বত্বের রায়তের সে অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল। তার পূর্ব থেকে কেবল মাত্র কায়েমি তালুক ও মোরশি মোকররি রায়তি জোতস্বত্ব হস্তান্তর করা যেতো (হক, ২০১৬)। পরবর্তীতে, ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৮৭৭ সালে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন প্রণীত হয়। এই আইনের ২১ এ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রি দলিল ছাড়া জমি কিনলে সেই জমির মালিক হওয়া যায় না। রেজিস্ট্রি ছাড়া হস্তান্তর দলিলের গ্রহণযোগ্যতা নেই। মামলা করেও মালিকানা

পাওয়া যাবে না। এই আইনে জমি ক্রয়-বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বায়নার কথাও বলা হয়েছে। এরপর ১৮৮২ সালে ভূমি হস্তান্তরে জটিলতা নিরসনের লক্ষে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ প্রণীত হয়। এই আইন সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক, দান, বিনিময় ও ইজারা ধরনের কয়েক প্রকার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়। এই আইনের ২৮ ধারা তেও রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে জমি ক্রয়-বিক্রয় করার কথা বলা হয়েছে। এই আইন কোনো সমন্বিত আইন নয় অথবা সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও এটি সকল নিয়মকানুন বিষয়ক দলিলের তাৎপর্যও বহন করে না। এই আইনের বহু ধারা ইতিপূর্বে নাকচ ও রহিতকৃত বিভিন্ন আইন থেকে গৃহীত হয়েছে (বাংলাপিডিয়া, ২০১৪)।

ব্রিটিশ আমলের ভূমি হস্তান্তর ব্যবস্থায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন হল রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮। এই আইনের ১৭(১) এর এ ধারা অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে বলা হয়েছে। দানকৃত বা হেবা ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রি করতে হয় কারণ হেবার ঘোষণা রেজিস্ট্রি ছাড়া বৈধ হয় না। এই আইনের ১৭ এ (২) ধারা অনুযায়ী বায়নানামার ক্ষেত্রেও দলিল রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যান্য দলিলের মত বায়নানামা সম্পাদন করতে হয় এবং সম্পাদনের ৩০ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। ৭৮ এ ধারা অনুযায়ী জমি হস্তান্তরে দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। জমি হস্তান্তরের সময় ভবিষ্যতে যাতে কোন জটিলতা না হয় সেদিকে সতর্ক হতে হয়। হস্তান্তরের সময় যিনি হস্তান্তর করছেন তার মালিকানার ভিত্তি আছে কিনা এবং হস্তান্তর করার এখতিয়ার আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হয় (খান,২০০৮)।

২.২.২ পাকিস্তান আমলে ভূমি হস্তান্তরের পরিবর্তনে আইন:

পাকিস্তান আমলে, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ আইনের মাধ্যমে রায়তগণ সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তর করার অধিকার অর্জন করে। অত্র আইনের ৮৮ ধারায় ভূমির সকল মালিককে জমির হস্তান্তর ও উত্তরাধিকাযোগ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (Kabir, 1961)। অবশ্য ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের মালিকানা সরকার সংরক্ষণ করেন। মালিক জমি সকল বৈধ উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন। তবে ১০০ বিঘার (বর্তমানে ৬০ বিঘা) বেশি জমির মালিকের নিকট জমি বিক্রয় করা যাবে না। এছাড়া প্রকৃত চাষী ব্যতীত অন্য কারো নিকট কৃষি জমি বিক্রয় করা যাবে না। জমি মালিকের জমি ধর্মীয় বিধান মোতাবেক উত্তরাধিকারীগণের উপর বর্তাবে তবে উপযুক্ত আইনানুগ উত্তরাধিকারী না থাকলে জমি সরকারের উপর বর্তাবে (ভূঞা ,২০০৪)। এই আইন ১৯৫০ সালে প্রণীত হলেও বাস্তবায়নে ১০ বছর সময় লেগে যায়। এ অন্তবর্তীকালীন সময়ে ভূমি গ্রাসের লক্ষ্যে অন্যান্য কায়েমি মহলের সরকারি অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগসাজসে তাদের অনুকূলে নতুন স্বত্ব সৃষ্টি করা, প্রজাস্বত্ব গোপন করা, জাল দলিল প্রস্তুত করে জমির দখলে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার মত সুযোগ সৃষ্টি হয় বিধায় পাকিস্তান আমলে ভূমি হস্তান্তরে জটিলতার অবসান হয়নি (Akram, 2012)।

২.২.৩ বাংলাদেশ আমলের সংশোধনী আইন:

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ (Transfer of Poperty Act 1882) এর মাধ্যমে ভূমি মূলত পাঁচভাবে হস্তান্তর করার অধিকার ছিল যেমন- বিক্রয়, মর্টগেজ, লিজ, উপহার ও বিনিময় । এছাড়া আরও পাঁচভাবে হস্তান্তর করা যায় যেমন- উইল, ওয়াকফ, ট্রাস্ট, বিভক্তি ও বেনামী বিক্রয় (Hasnat et al., 2018)।

২.৩ রায়ত/কৃষক ও জমিদারের/সরকারের সম্পর্কের পরিবর্তন

ভূমি ব্যবস্থার আইনগুলো কৃষকের অবস্থার প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও তাদের উন্নতির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন হয়নি। বিভিন্ন আমলের আইন কৃষক ও জমিদার বা সরকারের মধ্যকার সম্পর্কে আরও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। হিন্দু আমলে রাজ্যের সকল ভূমিরই স্বত্বাধিকারী এবং মূল মালিক দুই ছিলেন রাজা বা রাষ্ট্র। আদিযুগে প্রজাদের সকল কিছুর বন্দোবস্ত রাজারা করে থাকতেন। রাজারা প্রজাদের ভূমি হতে উৎখাত করতে পারত না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭০৪ সাল থেকে প্রজাদের জমি বন্দোবস্তের পাট্টা দেয়া শুরু করেছিল। পরবর্তীতে ১৭৫৭ সালে কোম্পানির শাসনকালে কোম্পানির কর্মচারী ও জমিদারদের শোষণ অত্যাচারের ফলে কৃষকের অবস্থার অবনতি ঘটে। কোম্পানির আমলে কৃষকের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি (মজুমদার, ১৯৯৪)।

২.৩.১ বৃটিশ আমলের আইনের প্রভাব:

বৃটিশ আমলে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের ফলে জমিদার কৃষকের কাছ থেকে ভূমি ভোগ দখল করে এবং তাদের স্থায়ী দখলিদারিত্ব ছিনিয়ে নেয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের ফলে আশা করা হয়েছিল যে ভূমি রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দেয়ার ফলে জমিদারগণ কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্য কাজ করবেন এবং কৃষকের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি বরং প্রজার নিকট থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করার জন্য আগের মতোই তাদের উপর অত্যাচার করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষক সম্পর্কের মাঝে নতুন এক মাত্রা সংযোজিত হয় যা অনেক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। এ আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগের ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন, ১৮৫০ সালের নীল বিদ্রোহ, ১৮৭২-৭৩ সালের পাবনা ও বগুড়া বিদ্রোহ ইত্যাদি। এই ব্যাপক কৃষক আন্দোলন শান্ত করার লক্ষ্যে পরবর্তীকালে ভূমি সম্পর্কিত কতিপয় আইন পাশ করা হয়েছিল যা ছিল সরকারি প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ (ইসলাম, ১৯৯৩)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বৃটিশ শাসনামলে কৃষক বা প্রজার দুর্দশা লাঘবের জন্যে প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন বা ১৮৫৯ সালের ১০ নং আইন। এই আইনের ফলে প্রজা বা রায়ত জমি ও জমার বিবরণ ও তার

স্বত্বের শর্তাবলি উল্লেখ করে ভূম্যাধিকারী কর্তৃক পাট্টা দেয়ার বিধান করা হয়েছিল। প্রজা অসন্তোষ দূরীভূত করার জন্য ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হলেও সম্পূর্ণ রূপে দুঃখ দুর্দশা লাঘব করতে পারেনি। ফলে কৃষকদের অসন্তোষ দূর করার লক্ষ্যে ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভা কর্তৃক এই আইনের কিছু মৌলিক পরিবর্তন করা হয়েছিল (হক, ২০১৬)। ১৯৩৭ এর পূর্বে বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন ছিল যা কৃষক-প্রজা নির্যাতনের একটি হাতিয়ার ছিল। ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে এ আইনটিকে সংশোধন করে এর নাম রাখেন 'বঙ্গীয় কৃষি খাতক সংশোধনী আইন'। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ১৯৩৮ সালে কৃষি খাতক আইনের আওতায় ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করা হয় ঋণগ্রস্ত কৃষক ও ঋণদাতা মহাজন উভয়ের উপকারের স্বার্থে। তবে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে ঋণ সালিশি বোর্ডকে অনেকে দায়ী করেন। ঋণ সালিশি বোর্ড সত্যিকারভাবে বাংলার ঋণগ্রস্ত কৃষক সমাজের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পেরেছিল কি-না তর্কসাপেক্ষ (বাংলাপিডিয়া, ২০১৪)। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দীর প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সময়ে ভাগচাষীদের 'তেভাগা আন্দোলন' কে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় আইনসভায় 'বেঙ্গল বর্গাদার (প্রভিশনাল) কন্ট্রোল বিল' নামে একটি বিল উত্থাপিত হয় যা লীগের জোতদার সদস্যদের বিরোধিতার কারনে ফলপ্রসূ হতে পারেনি (ইসলাম, ১৯৯৩)।

২.৩.২ পাকিস্তান আমলের আইনের প্রভাব:

পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের ফলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং সরকার ও রায়ত প্রজার মধ্যে জমিতে সকল মধ্যবর্তী স্বার্থের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সরকার ও রায়তের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের পরিবর্তন। এই আইনে জমিদারিপ্রথা বিলুপ্ত হলেও এক সোপানক্রমিক বিন্যাসের কিছু রাজস্ব কর্মকর্তা তার স্থলবর্তী হয়, আর এসব কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন সংস্থা হিসেবে থাকে ভূমি প্রশাসন বোর্ড (ভূঞা,২০০৪)। এই আইন ভূমিহীন কৃষকদের জন্য ভূমি পুনরায় বরাদ্দকরণের কোন অর্থবহ বিধানের উল্লেখ করেনি। এই আইন প্রণয়নের পর প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদারগণের জন্য সরকার ভূমির সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে সাধারণ কৃষক বিশেষ করে প্রান্তিক ও বর্গাদার কৃষকের সরকারের কাছ থেকে তাদের নায্য অধিকার লাভ করতে পারেনি (নওয়াজ, ২০১৪)।

২.৩.৩ বাংলাদেশ আমলের আইনের প্রভাব:

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন সরকার কৃষকদের বা সাধারণ মানুষের ভূমি সেবায় উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রান্তিক চাষি ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে বেশি জমির ভূম্যাধিকারীরা বর্গাচাষি সহজে পেত। এসব ভূম্যাধিকারীরা বর্গা প্রথার মাধ্যমে এক প্রকার মধ্যস্বত্বাধিকারী হয়ে পড়ে এবং বর্গাচাষিদের সাথে অনেক সময় তাদের সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে। এই অবস্থা নিরসনের জন্যে সামরিক

সরকার এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল (হক, ২০১৬)। এর ফলে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ পরিমান ৬০ বিঘা নির্ধারিত হয়। তবে ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমির মালিকদের জন্য সর্বোচ্চ সীমা পুনঃনির্ধারণ করে না কিন্তু নতুন কৃষি জমি অর্জন করতে বাধা দেয় (Islam, 2018)। এই অধ্যদেশের মাধ্যমেই বর্গাচাষি বা ভাগচাষি অধিকার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। তবে এই অধ্যাদেশে আইনগত জটিলতা ছিল যার ফলে বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে তেভাগা নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন ফসলের ভাগ করার প্রয়োগের অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল (Raihan et al., 2009)। স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে কৃষি খাসজমি বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের বিষয়ে নীতিমালা জারি করা হয়েছিল এবং এই নীতিমালার আওতায় খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম বহুপূর্বেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। তবে খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও অনিয়ম সংগঠিত হওয়া এবং বিভিন্ন সময়ে কৃষি খাসজমি বণ্টনের ফলে বন্দোবস্তযোগ্য জমির পরিমান কমে যাওয়া সহ সুষ্ঠু ও গণমুখী নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে এক আদেশের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন স্থগিত রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকাররা ক্ষমতায় এসেছে সাধারণ জনগন বা সাধারণ কৃষকদের ভোটের বিনিময়ে। তবে তাদের উন্নয়ন বা ভূমির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত ভূমি আইনের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয় (Herrera, 2016)।

২.৪ ভূমি দখল নিয়ে বিরোধ নিরসনে পরিবর্তন

আদিকাল থেকেই বাংলাদেশে ভূমি নিয়ে আত্মকলহ, ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, সালিশ বিচার, মামলা মোকদ্দমা, যুদ্ধ, বিগ্রহ, নানা সংগ্রাম ও আন্দোলন হয়েছে। হিন্দু আমলে জমির মালিক ছিল কৌম সমাজ এবং এক এক কৌম সমাজের লোক তাদের নিজ নিজ কৌমের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার জমি চাষ করতে পারতো। একই জমি চাষ করা নিয়ে একই কৌমের একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কৌমের পঞ্চায়েত বা প্রধানগণ ঐ বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলে মোঘল শাসন ব্যবস্থার অন্তিমকালে জমিদারগণ প্রভাবশালী হয়ে পড়ে এবং ইচ্ছেমতো রাজস্ব ধার্য করা ছাড়াও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে বিচারের ক্ষমতাও তাদের হাতে তুলে নিয়েছিল। ফলে জমি নিয়ে কোনো বিরোধ দেখা দিলে জমিদারগণ নিজের তত্ত্বাবধানে বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিত। এই সময় প্রজাদের ভূমিতে অধিকার রক্ষার্থে কোনো আইনের প্রয়োগ হয়নি যার আওতাধীনে তারা মামলা মোকদ্দমা করে ভূমিতে তাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করবে (হক , ২০১৬)।

২.৪.১ বৃটিশ আমলে ভূমি নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমি আইন:

বৃটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির একচ্ছত্র মালিক হয়ে প্রজাদের উপর নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচার করত। জমিদারের অত্যাচারের ফলে অনেক এলাকায় প্রজা বিদ্রোহ দেখা দেয়, অপরাধ ও মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই বৃটিশ সরকার ১৭৯৪ সালের ৪ নং রেগুলেশন প্রণয়ন করে যার ফলে জমিদারের অন্যায় খাজনা বৃদ্ধি বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাকে নবগঠিত জেলা দেওয়ানি আদালতে মামলা করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। এছাড়া জমিদার অন্যায় বা বেআইনিভাবে প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করলে, সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ বা নিলাম বিক্রি করলে বা প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করলে তার বিরুদ্ধে প্রজা দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার চেয়ে মামলা করতে পারতো। কিন্তু নিঃস্ব প্রজার পক্ষে প্রতাপশালী জমিদারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা প্রায় অসম্ভব ছিল (ইসলাম, ২০১০)। বৃটিশ সরকার প্রজাদের সম্পত্তি হস্তান্তরের বা ভূমিতে স্বত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ১৮৭৭ সালের ১লা মে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন প্রয়োগ করেছিল যার ফলে প্রজার নিজ জমিতে অধিকারভোগে কেউ বেআইনিভাবে বাঁধা দিলে দেওয়ানি আদালতে প্রতিকার চেয়ে মামলা করা যায় (খান, ২০০৮)। এছাড়া এ আইনের মাধ্যমে দেওয়ানি আদালতে মামলা করা যায় যদি জমি বিক্রেতা বায়নানামা অনুযায়ী দলিল রেজিস্ট্রি করে না দেয় এবং বিক্রেতাকে জমি বিক্রির দলিল করে দিতে বাধ্য করা যায় । পরবর্তীতে ১৮৯৩ সালের বাটোয়ারা আইন অনুযায়ী দেওয়ানি আদালতে বাটোয়ারা মামলা করে জমি ভাগাভাগি করে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল (খান, ২০০৮)। ১৯০৮ সালে তামাদি আইনের মাধ্যমে রায়ত বা দররায়তকে তার রায়তি স্বত্বের দখল ফেরত পাওয়ার জন্যে বেদখলের দুবছরের মধ্যে জমি বেদখলকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা করা হয় (হক,২০১৬)। এই আইনের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জমি বেদখলের সর্বোচ্চ ১২ বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হয় নতুবা ১২ বছর অতিক্রান্ত হলে তামাদির কারণে আর মামলা করা যায় না।

২.৪.২ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের প্রণীত আইনের প্রভাব:

মূলত ব্রিটিশ আমলের আইনগুলো পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে ভূমিতে সাধারণ জনগণের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ভূমি নিয়ে সকল প্রকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য। বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমি মামলা-মোকদ্দমার বিষয়টি জটিল ও সময়সাপেক্ষ। তবে বাংলাদেশের ভূমি মামলার বিষয়টি একান্ত আইনের বিষয় নয় বরং তা সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির এক জটিল সমীকরণ। এ দেশে বছরে ভূমি-কেন্দ্রিক চলমান মামলার সংখ্যা ২৫ লাখ, যা মোট চলমান মামলার ৭৭%। ভূমি মামলার সাথে দেশের জাতীয় ও পারিবারিক অপচয় সম্পর্কিত। কেননা, ভূমি ও ভূমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মানুষ পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হচ্ছে (পাল, ২০২১)। ভূমি মামলা ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর করতে ভূমিকা রাখে। ভূমি মামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুর্বল জনগোষ্ঠী (মহিলা, দরিদ্র

জনগোষ্ঠী,ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ)। কারণ ভূমি মামলার আর্থিক ব্যয় অনেক বেশি । এই মামলা-মোকদ্দমায় বাদী-বিবাদী কেউই আসলে জেতেন না। ভূমি মামলা দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর অনুন্নয়নে ভুমিকা রাখে এবং দেশের ভূমি ব্যবস্থার সার্বিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে (বারকাত, ২০০৪)।

৩. অধ্যায় পরিশেষ

ভূমি আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তণে অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করেছে। বৃটিশদের প্রণীত আইন ভূমি মালিকানা, হস্তান্তর , স্থানান্তর, বিরোধ নিরসন এবং সরকার ও কৃষকদের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যার ধারাক্রম পাকিস্তান আমল ও বর্তমান বাংলাদেশ আমলেও অব্যাহত রয়েছে। যদিও বৃটিশদের প্রণীত আইন বিভিন্ন সংশোধন ও পরিমার্জন করে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হচ্ছে তবে সাধারণ মানুষের চাহিদামাফিক ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমি আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। ভূমি আইনে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যাবলীর কারণে ভূমি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

অধ্যায় ৩

ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তন

১. সূচনা

ভূমি ব্যবস্থার আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভূমি প্রশাসন। ভূমি প্রশাসন মূলত ভূমির সাথে জড়িত বিভিন্ন কার্যাবলী সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য গড়ে উঠেছে। ভূমি প্রশাসন ব্যতীত ভূমি ব্যবস্থাকে কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ভূমি ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুসজ্জিত, সুসংগঠিত ও দক্ষ ভূমি প্রশাসন প্রয়োজন (Hossain, 2015)। ভূমি প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো ভূমি ব্যবস্থার যাবতীয় কার্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আমলে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকেই ভূমি প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। মূলত ভূমি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বৃটিশ আমলে ভূমির প্রশাসনিক কাঠামো গঠিত

হয়েছে এবং ভূমির সাথে সম্পর্কিত সকল সেবা নাগরিকদের প্রদানের জন্য ধীরে ধীরে এর বিস্তার ঘটেছে। এ অধ্যায়ে বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান আমল পর্যন্ত ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তনঃ

বাংলায় ভূমি ব্যবস্থাকে শাসন করার জন্য বৃটিশ সরকার প্রথম ভূমি প্রশাসনের সাংগঠনিক রূপ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ভূমি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আরো বিস্তৃত হয়েছে। মূলত ভূমি প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর । বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থার বেশিরভাগ প্রশাসনিক কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে। তবে ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনে আরও দুইটি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে যেমনঃ আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর ভূমি মালিকানা নিবন্ধন এর কার্যক্রম এবং স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাঠ প্রশাসন করে থাকে। ভূমি প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূমি ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। নিম্নে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তন বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছেঃ

২.১ রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পরিবর্তন

হিন্দু আমলে (৩২০ খ্রি. পূ.- ১২০২ খ্রিস্টাব্দ) ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা মূলত ভূমি রাজস্ব আদায়ে বেশি কাজ করত এবং ভূমি রাজস্ব আদায় করার দায়িত্বে থাকত গ্রামপ্রধান রাজা বা রাষ্ট্র। সকল সরকারি কর্মচারী রাজস্ব আদায়ের জন্যে সরকারি কোষাগার থেকে বেতন পেতেন তবে নতুন আবাদ করা উপনিবেশে স্থানিক্য ও গোপ নামক কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান করা হত। মুসলিম শাসনামলেই (১২০২ খ্রি. -১৮৫৮ খ্রি.) বঙ্গদেশে ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব আদায় পদ্ধতি সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল প্রাদেশিক দেওয়ান (Hasnat et al., 2018)। প্রাদেশিক শাসনকর্তা রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সৈন্য পাঠিয়ে কর প্রদানকারী সামন্তদের নিকট থেকে কর সংগ্রহ করত কিন্তু রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বে ছিল না। রাজস্ব প্রশাসন ও আদায়ের সুবিধার্থে সুবা বাংলাকে কতিপয় সরকার বা জেলায় এবং সরকারদের কতিপয় মহাল বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরবর্তীতে সরকারের সংখ্যা কমিয়ে সমস্ত সুবাকে বিভিন্ন চাকলা বা বৃহত্তর জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। সরকার বা চাকলার প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে আমল্গুজার, আমিল বা ক্রোরী বলা হত এবং মহাল বা পরগণার রাজস্ব কর্মকর্তাকে আমিল বা শিকদার বলা হত। আমিলের দায়িত্ব ছিল তার এলাকার জমিদার, ইজারাদার প্রভৃতির নিকট থেকে সরকারের ধার্য রাজস্ব আদায় করা এবং তা ফোতেদার বা খাজাঞ্চির নিকট সরকারি কোষাগারে জমা

দেয়া (হক, ২০১৬) । হিন্দু ও মুসলিম আমলের পর বৃটিশ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭ ইং) ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে।

২.১.১ ব্রিটিশ আমলের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা (বোর্ড অব রেভেনিউ)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ক্ষমতা দখলের পর ১৭০০ সালে কোম্পানির গভর্নরের কাউন্সিলের একজন সদস্যের ওপর জমিদারি প্রশাসনের ভার দেয়া হয়েছিল। কোম্পানি ইংল্যান্ডস্থ কর্তৃপক্ষ 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর' কাউন্সিলে ১ জন অতিরিক্ত সদস্য 'জমিদার' বা 'কালেক্টর' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। পরবর্তীতে ১৭৫৮ সালে কোম্পানি ২৪-পরগণার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কালেক্টরের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে 'কমিটি অফ নিউ ল্যান্ডস' নামক পরিষদের ওপর বর্তায়। এই পরিষদের প্রধান কাজ ছিল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনের তদারকি করা (ইসলাম, ২০১০)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৯ সালে রাজস্ব বিভাগ পরিচালনার জন্য মুর্শিদাবাদে 'রেভিনিউ কাউন্সিল' এবং কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে 'কালেক্টিং কমিটি অফ রেভিনিউ' গঠন করেছিল। রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব প্রশাসনের তদারক করার জন্যে প্রতি জেলায় একজন ইংরেজ সুপারভাইজার বা ত্বত্তাবধায়ককে রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার এবং সে সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া কৃষকের ওপর যেন জমিদার, তালুকদার, আমিল প্রভৃতি অত্যাচার না করতে পারে তা দেখার দায়িত্বও তাদের দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে 'প্রদেশিক কাউন্সিল' গঠন করা হয়। তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সুপারভাইজারি প্রথা এবং কমিটি অব রেভিনিউ বাতিল করে 'বোর্ড অব রেভেনিউ' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করেন ১৭৭২ সালে। এই সংস্থা গঠন করা হয়েছিল দেওয়ানি ও রাজস্ব বিভাগ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। মূলত এই বোর্ডের প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় ও ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা (ভূঞা, ২০০৪)। সেসময় সুপারভাইজার পদের পরিবর্তে 'কালেক্টর' করা হয়েছিল (ইসলাম, ২০১০)। প্রাদেশিক কাউন্সিলকে বিলুপ্ত করে বোর্ড অব রেভেনিউকে আরও শক্তিশালী করা হয় ১৭৮১ সালে। এই একই বছরে বাংলাকে ৩৪টি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলায় একজন ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বেঙ্গল বোর্ড অব রেভেনিউ রেগুলেশন, ১৮২২ এর আওতায় বেঙ্গল বোর্ড অব রেভেনিউ সুপ্রতিষ্ঠিত ও চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। দেশের সকল ভূমি জরিপ ব্যবস্থা, খাজনা ধার্য, খাজনা আদায় সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, জমি রেজিস্ট্রিকৃত আইন, স্ট্যাম্প আইন, ট্রেজারি আইন ও অন্যান্য আইন এবং রাজস্ব এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। বোর্ড অব রেভিনিউ এর নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন পরিচালিত হতো। ১৯৩৭ সালে পৃথক রাজস্ব বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ফলে ১৯৩৭ সাল হতে বোর্ড অব রেভিনিউ এর ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে (ভূঞা, ২০০৪)।

২.১.২ পাকিস্তান আমলের রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট বা রাজস্ব বিভাগ

পাকিস্তান শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১) ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে আরও সুবিন্যস্ত করার জন্য এবং বোর্ড অব রেভিনিউ ও এর অধীনস্ত অফিসসমূহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনের জন্য রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট নামে নতুন একটি ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করা হয় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অধীনে। এই ডিপার্টমেন্টের বোর্ড অব রেভিনিউ গঠিত হত কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন ৩ বা ৪ জন সদস্য নিয়ে এবং এদের মধ্যে একজনকে সিনিয়র সদস্য বলা হত। ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দ্যেশে প্রতিটি জেলায় কালেক্টরকে সহায়তা করার জন্য একটি অতিরিক্ত বা যুগ্ম কালেক্টর (রাজস্ব) এবং একটি রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরের পদ, প্রতি মহকুমার জন্য একটি করে মহকুমা ম্যানেজারের পদ এবং প্রতি থানার জন্য একটি করে সার্কেল অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয় (ইসলাম, ২০১০) । প্রতিটি তহসিলে যা দুটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত একজন করে তহসিলদার নিয়োগ করা হয় এবং এদের সাহায্যকারী হিসেবে এক বা দুইজন সহকারী তহসিলদার নিযুক্ত করা হয়। বোর্ড অব রেভিনিউ এর কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এর অধীন সেটেলমেন্ট অফিস তত্ত্বাবধান করা। এছাড়া ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত জেলাসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ পরিবীক্ষণ করা, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারক করা, ভূমি সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা এবং কমিশনার, কালেক্টর ও অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আনীত সকল আপিলের শুনানি ও চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করাও রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বা রাজস্ব বিভাগ এর অন্যতম কাজ ছিল (বাংলাপিডিয়া, ২০১৪)। এছাড়া ১৮৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস অ্যাক্টের বিধান অনুসারে কোর্ট অব ওয়ার্ডস হিসেবে দায়িত্ব পালন করাও বোর্ডের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বোর্ড অব রেভিনিউ ছিল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষ।

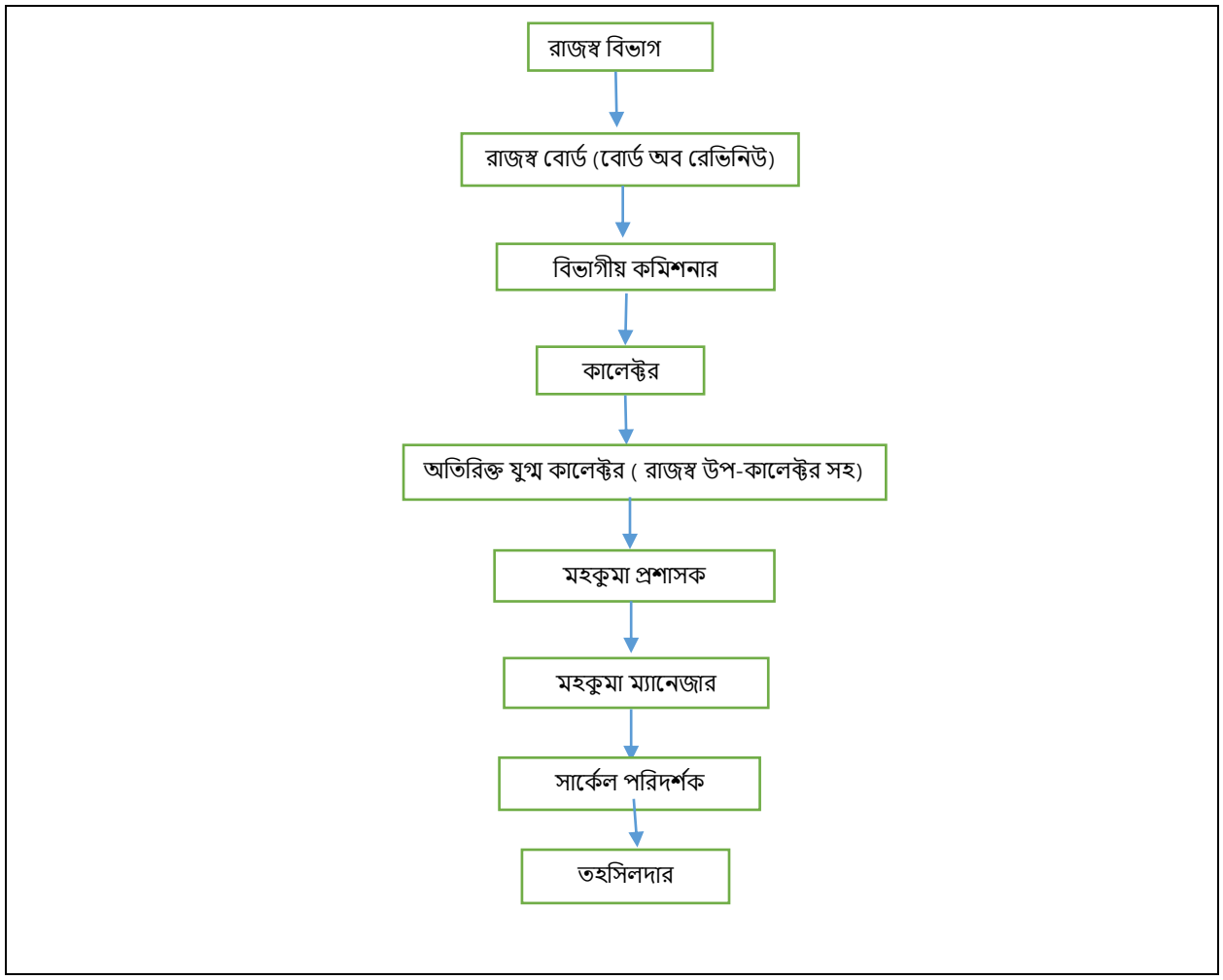

চিত্র ১: পাকিস্তান আমলের ভূমি প্রশাসন সূত্র: ভূঞা (২০০৪)

২.১.৩ বাংলাদেশ আমলের ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট এর পরিবর্তে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয় এবং পরবর্তীকালে এই বিভাগকে পূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৩ মার্চ, ১৯৭৩ তারিখে জারীকৃত আইএম-১০/৭২/১১৫(৫) আরএল নম্বর আদেশবলে বোর্ড অব রেভিনিউ এবং অধীনস্থ অফিসসমূহ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং বোর্ডের কার্যাবলি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়। রাজস্ব অফিসসমূহ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকে পদাধিকারবলে ভূমি সংস্কার কমিশনার নিয়োগ করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে রাজস্ব অফিসসমূহ পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয়ের ৪ জন উপ-সচিবকে পদাধিকারবলে উপভূমি সংস্কার কমিশনার নিয়োগ করা হয়। ভূমি সংস্কার কমিশনার এবং উপভূমি সংস্কার কমিশনারগণ ভূমি প্রশাসন ও ভূমি

সংস্কার মন্ত্রণালয়ে থেকেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। ১৯৭৫ সালে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় করা হয় এবং এর অধীনে দুটি বিভাগ যথাক্রমে– ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ ও খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সালে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয় ভূমি সংস্কার আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে ০১/০৩/১৯৮৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয় যা এখনো বলবৎ আছে (www.landministrybd.com, 2021)।

২.১.৪ স্বাধীনতার পর রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সমস্যা

১৯৭৮ সালে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের মূল কাজের মধ্যে প্রাধান্য ছিল নীতি নির্ধারণ করা। কিন্তু এই মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি বেশ বেড়ে যায় যখন রাজস্ব সংগ্রহের পাশাপাশি ভূমি অধিগ্রহণ, শত্রু সম্পত্তি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এর দায়িত্বভুক্ত হয়। ফলে সেটেলমেন্ট অপারেশন, দিয়ারা জরিপ, খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, আন্তঃরাষ্ট্র সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি বিষয় তদারকি করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালনের ফলে মন্ত্রণালয় ভূমি সংস্কার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও ভূমিসংক্রান্ত আপিলের শুনানি দিয়ে নিষ্পত্তি করতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয় (ভূঞা, ২০০৪)। দেশে মুখ্য কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ না থাকায় বিভাগীয় কমিশনারগণ, জেলা প্রশাসকগণ, ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের পরিচালক এবং অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তা ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ, আদেশ-নির্দেশ ও দিক-নির্দেশনা লাভে ব্যর্থ হয়ে তাদের দায়িত্বাধীন বিষয়াদি নিষ্পত্তিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। এসব অসুবিধা উপলব্ধি করে সরকার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সাবেক বোর্ড অব রেভিনিউ– এর মতো একটি সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভূমি প্রশাসন বোর্ড আইন, ১৯৮০ (১৯৮১ সালের ১৩ নম্বর আইন) প্রণয়ন করে (হক, ২০১৬)।

২.২ ভূমি প্রশাসনের মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তন

প্রাচীনকালে হিন্দু আমলে ভূমিতে রাজস্ব আদায় নিয়ে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব হলে পঞ্চায়েত তা নিষ্পত্তি করতো। পঞ্চায়েত ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতো এবং একজনের দখলি জমি অন্যে ব্যবহার করতে পারতো না । পরবর্তীতে মুসলিম আমলে বিভিন্ন রাজার বিভিন্ন প্রশাসন ভূমি রাজস্ব বা কর নিয়ে মামলা নিষ্পত্তি করার দায়িত্বে ছিল। মোঘল আমলে রাজস্ব নির্ধারণ ও জমা বন্দোবস্ত বা বিরোধ অবসান করতে আমিনকে সরকার ও চাষির মধ্যে বিচারকের ভূমিকা

পালন করতে হত। তবে মোঘল শাসনের পতনের যুগে জমিদারগণ প্রভাবশালী হয়ে প্রশাসন ও বিচারের ভার তাদের হাতে তুলে নিয়েছিল (নওয়াজ, ২০১৪)। বৃটিশ আমলে বোর্ড অব রেভিনিউ বা রাজস্ব বোর্ড ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে কাজ করত। ভূমি রাজস্ব বা বন্দোবস্ত নিয়ে জমিদার ও রায়তদের মধ্যে কোন সমস্যা হলে জেলা কালেক্টর তা নিষ্পত্তির জন্য রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করে সমস্যার সমাধান করত। পাকিস্তান আমলে রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় যার তত্ত্বাবধানে বোর্ড অব রেভিনিউ ভূমি রাজস্ব ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের কাজ করত। বোর্ড অব রেভিনিউ এর নিয়মিত দায়িত্ব ছিল বিভাগীয় কমিশনারগণের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি প্রদান করা (মজুমদার, ১৯৯৪)।

২.২.১ বাংলাদেশ আমলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড গঠন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি মন্ত্রণালয় গঠিত হলে বোর্ড অব রেভিনিউ এর ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে ভূমি মালিক ও সরকারের মাঝে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, আপিল নিষ্পত্তি ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায় উহার মৌলিক নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় বোর্ড অব রেভিনিউ এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে ১৯৮০ সালে ভূমি প্রশাসন বোর্ড আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ১৯৮১ সালে এই আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। ১৯৮১ সালে ১৩ নং আইন বলে বিলুপ্ত বোর্ড অব রেভিনিউ এর স্থলে 'ভূমি প্রশাসন বোর্ড' গঠিত হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি প্রশাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ করে বিভিন্ন সময়ে আদেশ জারি করে এবং বিধিবদ্ধ আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তিকরণ, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নে সরকারি নীতি ও নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিস কর্তৃক যথাযথ বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান এবং সরকারকে ভূমি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাহিদা মোতাবেক পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায়, নতুন তহসিল অফিস স্থাপন, খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, অভ্যন্তরীণ অডিট অফিস নিয়ন্ত্রণ এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এই বোর্ডের ওপর অর্পিত হয় (আলবেরুনী, ২০১৫)।

২.২.২ ভূমি প্রশাসন বোর্ডের বিলুপ্তি ও ভূমি আপীল বোর্ড গঠন

ভূমি প্রশাসন বোর্ড মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যাবলি তদারক এবং ভূমি সম্পর্কিত মামলার যথাযথ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদ ১৯৮৯ সালে ভূমি প্রশাসন বোর্ড বিলুপ্ত করে তদস্থলে ভূমি আপিল বোর্ড এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড নামে দুটি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । মূলত এই দুটি বোর্ড ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনার জাতীয় পর্যায়ে কাজ করে থাকে। বর্তমানে ভূমি আপিল বোর্ড ১৬ ই মার্চ, ১৯৮৯ হতে ভূমি সংক্রান্ত

মামলার চূড়ান্ত আপিলেট কর্তৃপক্ষ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মূলত এই বোর্ড ১৯৮৯ সালের ২৪ নং আইন পাশ করে ভূমি আপিল বোর্ড আইন ১৯৮৯ এর ৮(১) ধারায় ভূমি প্রশাসন বোর্ড আইন, ১৯৮০ রহিত করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি আধাবিচারবিভাগীয় প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ হিসেবে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সমন্বয়ে ভূমি আপিল বোর্ড আইনের ৪ ধারার ক্ষমতাবলে ভূমি আপিল বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত আইনের ৫ ধারায় বোর্ডের এখতিয়ার সম্বন্ধে বিধান রয়েছে যে, বোর্ড তার ওপর সরকার কর্তৃক অথবা কোন আইনের দ্বারা কিংবা আইনের অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে। ভূমি মন্ত্রণালয় ৯ অক্টোবর, ১৯৯০ ভূমি আপিল বোর্ড বিধিমালা, ১৯৯০ প্রণয়ন ও জারি করে। এই বিধিমালার ৩ বিধিতে বোর্ডের কার্যবণ্টন ও পদ্ধতি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে (হক, ২০১৬)।

এই বোর্ড ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিবিষয়ক সমুদয় আইনের অধীনে ভূমিসংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়), নামজারি ও খারিজ মামলা, সায়েরাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা, ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত সার্টিফিকেট মামলা, খাসজমি বন্দোবস্ত বিষয়ক মামলা, পি.ডি.আর অ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপিল মামলা এবং অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলায় বিভাগীয় কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল/রিভিশন মামলা গ্রহণ ও শুনানি করে নিষ্পত্তি করতে পারে। উক্ত বিধিতে ভূমি আপিল বোর্ডকে অধস্তন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ভূমিসংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শদান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভূমি আপিল বোর্ড ১৯৯০ (সংশোধন আইন) এর আওতায় ভূমি আপিল বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধে কেউ ক্ষুব্ধ হলে তাকে ৬০ দিনের মধ্যে তা পুনঃবিবেচনার জন্য উক্ত বোর্ডের নিকট আবেদন দাখিল করার এখতিয়ার দেয়া হয়। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ পৃথক এবং এককভাবে পক্ষগণকে শুনানিক্রমে আপিল/রিভিশন ও পুনর্বিবেচনার আবেদনের ওপর আদেশ প্রদান করেন এবং উক্ত আদেশ বোর্ডেরও আদেশ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের পুনর্বিবেচনা মামলায় আইনগত জটিলতা বা আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে চেয়ারম্যান বিষয়টি ফুল বোর্ডে (চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড) বিবেচনার জন্য উপস্থাপনের আদেশ প্রদান করতে পারেন এবং ফুল বোর্ড শুনানির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। পক্ষগণ স্বয়ং অথবা নিযুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে আপিল/রিভিশন ও পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করতে পারেন। বোর্ড প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার কোন বিধান নেই। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি প্রশাসন আইন সম্পর্কিত মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে ভূমি আপিল বোর্ড সর্বোচ্চ ভূমি আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে (www.landministrybd.com, 2021) ।

২.৩ ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পরিবর্তন

ভূমি সংস্কার দ্বারা দুটি বিষয় যথা: ক) জমির মালিকানা ও আবাদি জমির একক এবং খ) জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অংশ সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হবে তা নির্ধারিত হয় (কামাল সিদ্দিকী, ১৯৯৩)। হিন্দু আমলে এ দুটি বিষয় রাজসরকার নির্ধারণ করত এবং গ্রামপ্রধান তা পরিচালনা করত (হক, ২০১৬) । মুসলিম আমলে জমিদারগণ গ্রামপ্রধানদের ক্ষমতা হ্রাস করে ভূমি এবং খাজনা আদায় করার দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছিল। এই আমলে জমিতে কৃষকের চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দখলিস্বত্ব ছিল এবং লোকসংখ্যা অপেক্ষা কর্ষণযোগ্য জমি অনেক বেশি ছিল বিধায় ভূমি সংস্কারের কাজ কম ছিল। তবে জমিদার, ইজারাদারগণ কৃষকের পতিত জমি আবাদ করা ও আবাদের ফলে রাজস্বের হার কমানো এবং জমিতে উৎপন্ন ফসলের গড় পরিমাণ ও গড় মূল্য নির্ধারণ করে রাজস্ব ধার্য করা ইত্যাদি সংস্কারের দায়িত্বে ছিলেন (Chowdhury, 2017)। মুসলিম শাসনামলের পরবর্তী সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের পর ১৭০০ সালে কোম্পানির গভর্নরের কাউন্সিলের একজন সদস্যের ওপর জমিদারি প্রশাসনের ভার দেয়া হয়েছিল এবং পাটওয়ারি বা ইহতিমামদারের মাধ্যমে প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করা হতো। কোম্পানি আমলে ভূমি ব্যবস্থায় ভূমি রাজস্ব আদায়ের ওপর বেশি জোড় দিয়েছিল বিধায় অনেক জমিদার বা ইজারাদারগণ প্রজাদের নিকট থেকে শুধু ভূমির রাজস্ব বা খাজনা কিভাবে আদায় করা সেদিকেই লক্ষ্য রাখতেন গাঙ্গুলী, ২০১২)। বৃটিশ আমলে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যা ভূমিতে জমিদারদের স্থায়ী স্বত্ব লাভে অনেকাংশে ভূমিকা পালন করে। সাধারণ রায়ত বা প্রজারা ভূমিতে তাদের স্বত্ব হারানোর ফলে ভূমিতে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। তাই বৃটিশ সরকার ভূমিতে ফলপ্রসূ ভূমি সংস্কার আনয়নে ব্যর্থ হয়েছিল। যদিও ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে কৃষকের শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল কিন্তু জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাবের কারণে বোর্ড অব রেভিনিউ বা রাজস্ব বোর্ড কার্যকরী সংস্কার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারেনি (Billah, 2017)।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালের জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন যা বর্তমানে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এর মাধ্যমে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে জমির চাষি প্রজাদের সরাসরি সরকারের প্রত্যক্ষাধীনে আনা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে যেমন চাষি প্রজাগণ সরকারের অধীনে ছিল এবং আমিল, জমিদার, খারিজা বা চিরস্থায়ী তালুকদার প্রভৃতি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমি ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় ও সংস্কারের কাজ করত জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর সে দায়িত্ব বর্তায় সরকারের নিযুক্ত রাজস্বকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর । ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা কালেক্টর জেলার প্রধান কর্মকর্তা ছিল যার তত্ত্বাবধানের জেলার ভূমি সংস্কারের কাজ পরিচালনা হত রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে (হক, ২০১৬)। বৃটিশ আমলে জমিদারদের অত্যাচারে অনেক কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল এবং পাকিস্তান আমলে সরকারের রাজস্ব বিভাগের মাঠ প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারীরাও সঠিক

ভূমি সংস্কার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত না থাকার ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ আমলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার জন্য আলাদা অধিদপ্তর বা বোর্ডের গঠনের ওপর চাপ পড়েছিল । সেই সুবাদে ১৯৮৯ সালে ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই বোর্ড গঠিত হয়েছিল (ভূঞা,২০০৪)।

২.৩.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, বাস্তবায়ন পরীক্ষণ এর জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮৯ সালে ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এবং এই অধ্যাদেশের আওতায় ভূমি সংস্কার বোর্ড মাঠ প্রশাসন যথাক্রমে বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা/থানা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অফিস সমূহের ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত কাজের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে। ভূমি সংস্কার বোর্ড আইনের ৪ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সমন্বয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিসংস্কার কমিশনার এবং উপ ভূমি সংস্কার কমি শনারের পদসমূহ অবলুপ্ত করা হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে ভূমি সংস্কার কার্যক্রম ও ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করার জন্য প্রতি বিভাগে একটি উপভূমি সংস্কার কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয়। উক্ত আইনের ৫ ধারায় বোর্ডকে সরকার কর্তৃক অর্পিত ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (বাংলাপিডিয়া, ২০১৪)।

১৯৮৯ সালের ২৩ মে তারিখে সরকার কর্তৃক দায়িত্ব অর্পণ করে একটি আদেশ জারি করা হয়। অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে: জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ, বিভাগীয় পর্যায়ে উপভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান, খাসজমি চিহ্নিতকরণ এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং বেদখলি খাসজমি উদ্ধার, ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ ও আদায়, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর ব্যবস্থাপনা ও তদারকি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে রেকর্ড রুম স্থাপন, তদারকি ও পরিদর্শন এবং বোর্ডের সকল সংস্থাপন ও হিসাব সম্পর্কিত সাধারণ প্রশাসন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সাপেক্ষে ভূমি সংস্কার বোর্ড তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকে (হক, ২০১৬)।

২.৪ রেকর্ড ও জরিপ প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন

প্রাচীন হিন্দু আমলে রাজসরকার বা সামন্ত বা রাজা ভূমি জরিপ করে ভূমির শ্রেণি, উর্বরতা, কর্ষিত, কর্ষণযোগ্য এবং কর্ষণ অযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ করত। এছাড়া রাজস্ব যোগ্য ভূমি ও রাজস্বের পরিমাণ, সামন্তদের ভোগধিকারের জমির পরিমাণ এবং দানকৃত জমির পরিমাণও জরিপ করে নির্ধারণ করার দায়িত্ব রাজ সরকারের

উপর ছিল। মুসলিম আমলে আফগান শূর বংশীয় শাসক শেরশাহ সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে তার উজির টোডরমলের সহযোগিতায় ভূমির সার্বজনীন মানসম্মত মাপ ও জরিপ ও জরিপ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয় (ভূঞা, ২০০৪)। আকবরের আমল থেকেই ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন কর্মকর্তা নির্ধারিত ছিল যাদের মধ্যে কারকুন ছিলেন জরিপ ও রাজস্ব নির্ধারণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণকারী । মোঘল আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য মাল্গুজার, ক্রোরী, আমিল, জমিদার ইজারাদার প্রভৃতির ওপর এবং জরিপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল আমিন, কারকুন, কানুনগো, চৌধুরী, মণ্ডল, পাটওয়ারি ও অন্য জরিপ কর্মচারীদের ওপর। তবে এসব কর্মচারীদের ক্ষমতা কমে যায় মোঘল শাসনের পতনের যুগে যখন জমিদারগণ প্রভাবশালী হয়ে প্রশাসন ও বিচারের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল (Herrera, 2016)।

মুসলিম শাসনামলের পর কোম্পানি ক্ষমতা লাভ করে ১৭৭০ সালে ভূমি প্রশাসনে সুপারভাইজার নিয়োগ করে আমিলদের কাজের তদারকি করে। কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায় করা যার ফলে ভূমি জরিপ ব্যবস্থার জন্য আলাদা দপ্তর সৃষ্টি হয়নি। মূলত বোর্ড অব রেভিনিউ বা রাজস্ব বিভাগ কালেক্টরদের মাধ্যমে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থা পরিচালিত করত। পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার ১৮৮৩ সালের ২ মার্চ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটি ভারতীয় আইন সভায় পেশ করে এবং ১৮৮৫ সালে তা অনুমোদন লাভ করে। উল্লিখিত আইনের অধীনে খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পর্যালোচনার জন্য ১৮৮৪ সালে ভূমি রেকর্ড ও কৃষি নামে একটি দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। দপ্তরটির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হয় বোর্ড অব রেভিনিউর হাতে। ১৮৮৮ সালে কৃষি একটি স্বতন্ত্র দপ্তর হিসেবে গঠিত হওয়ায় দপ্তরটি ভূমি রেকর্ড দপ্তর নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন জরিপ কাজ পরিচালনা করত সার্ভে অব ইন্ডিয়া নামে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান (হক, ২০১৬)।

২.৪.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর:

১৯১৯ সালে জরিপের কাজ ভূমি রেকর্ড দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং দপ্তরটিকে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সরকারের আমলে এটি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে রুপান্তরিত হয় এবং এর কার্যক্রমের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং অফিসের নামকরণ করা হয় 'ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে' (ভূঞা,২০০৪)। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত উপসচিব পদ মর্যাদার একজন পরিচালকের অধীনে এ পরিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭৫ সালে যুগ্মসচিব একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিদপ্তরটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকে মহাপরিচালকের অধীন উপসচিব পদ মর্যাদার ২ জন পরিচালক যথাক্রমে (১) পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) ও (২) পরিচালক (জরিপ) দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি পরিচালক (প্রশাসন) এর পদ সৃষ্টি হয় এবং মহাপরিচালক পদটি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করে পরিচালকের ৩টি পদ যুগ্মসচিব পদ মর্যাদায় উন্নীত করা হয় (আলবেরুনী, ২০১৫)।

এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে একজন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে ১০ টি স্থায়ী জোনাল সেটেলম্যান্ট অফিস এবং এর অধীনে ২০৯ টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলম্যান্ট অফিস সৃষ্টি করা হয়। ২০১১ সালে আরও ৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীনে ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়। এই অধিদপ্তর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমগ্রদেশ অথবা কোন জেলা বা জেলার অংশ বিশেষের স্বত্বলিপি এবং মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত সংশোধন করবার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন, দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিত করা, স্ট্রীপ ম্যাপ প্রস্তুত করা ও তা মুদ্রণ করা এবং সীমানা খুঁটি সংরক্ষণ করা সহ যাবতীয় কার্য সমাধান করে থাকে। ভূমি রেকর্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজে জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস সমূহের কাজের তদারক, নিয়ন্ত্রণ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করাও অত্র অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব (ভূঞা, ২০০৪)।

২.৪.২ জোনাল সেটেলম্যান্ট অফিস:

উপসচিব পদমর্যাদার একজন অফিসার জোনাল সেটেলম্যান্ট অফিসারের দায়িত্বে থাকেন। চার্জ অফিসার/ সহকারী সেটেলম্যান্ট অফিসার পদবিধারী ৩ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা তাকে সার্বিক সহায়তা করেন। অপরাপর ২৪ জন বিভিন্ন শ্রেণির কারিগরী উপদেষ্টা সহ কর্মকর্তা/কর্মচারি সহ জোনাল সেটেলমেন্টের জনবলে অন্তর্ভূক্ত। একটি বৃহত্তর জেলার মাঠজরিপ কার্যক্রম থেকে শুরু করে রেকর্ড ভলিউম হস্তান্তর পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয় সাধন ও তদারকী করা অত্র অফিসের কাজ, অত্র অফিস সরাসরি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে ১০ টি বৃহত্তর জেলার জরিপ চলছে। যেমন- কুমিল্লা, ফরিদপুর, বগুড়া, যশোর, রংপুর, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট। বর্তমানে ঢাকা,দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, রংপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিলেট, ফরিদপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী জেলায় জোনাল সেটেলম্যান্ট অফিস রয়েছে (MOL, 2003))।

২.৪.৩ উপজেলা সেটেলম্যান্ট অফিস:

সরকার অনুমোদিত জোনাল জরিপ স্কিমের আওতায় প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের স্থায়ী অবকাঠামো প্রবর্তন করা হয়। সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছিলেন উপজেলা সেটেলম্যান্ট অফিসের ও প্রধান। বর্তমানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কর্তৃত্ব বাতিল করা হয়েছে। উপজেলা

পদের নাম সহকারী সেটেলম্যান্ট অফিসার। তাকে সহায়তা করেন দুজন উপ-সহকারী সটেলম্যান্ট অফিসার, পেশকার, সার্ভেয়ার, ডিম্যানসহ ১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী। সারাদেশের ২০৯ টি উপজেলায় স্থায়ী ভাবে জরিপ অফিস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ২৩৩ টি উপজেলায় স্থায়ী জরিপ অফিস চালু কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে (MOL, 2014)।

২.৫ ভূমি প্রশাসনে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পরিবর্তন

হিন্দু আমলে বিভিন্ন রাজ্যশাসনামলে রাজকর্মচারীদের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্য পরিচালনায় প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। মুসলিম আমলে বিভিন্ন মুসলিম শাসকের শাসনামলে ভূমি প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে ভূমি সম্পর্কিত সকল কাজ পরিচালনা করত। তখন আলাদা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না (হক, ২০১৬)। বৃটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বোর্ড অব রেভিনিউ বা রাজস্ব বোর্ডের অধীনে কর্মরত কর্মচারীরা জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ও ভূমি বন্দোবস্তের কাজ করাতো। ভূমি প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারীদের ভূমি ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। পাকিস্তান আমলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ফলে ২.৫ কোটি রায়ত ভূমি মালিকের সৃষ্টি হয় যারা সরকারের কোষাগারে খাজনা প্রদানের অধিকারপ্রাপ্ত হয়। এ ভূমি মালিকগণের থেকে খাজনা আদায়ের জন্য প্রয়োজন হয় বিশাল কর্মচারীর এবং বিপুল মাঠকর্মীর। সরকার সার্কেল অফিসার, তহশীলদার, সহকারী তহশীলদার দ্রুত নিয়োগ করে নামেমাত্র প্রশিক্ষণ বা কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ছাড়া যার ফলে খাজনা তালিকা, রেকর্ড ও জরিপ প্রস্তুতকরণ জটিল হয়ে পড়েছিল (ভূঞা, ২০০৪)। তাছাড়া জেলা প্রশাসকগণও কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভূমি সংস্কারের জন্য প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদানে আগ্রহী ছিলেন না (নওয়াজ,২০১৪)। তবে গভর্নমেন্ট এস্টেট ডিপার্টমেন্টের খাস তহসিলদারদের মধ্যে হতে "কোর্ট অব ওয়ার্ড এস্টেট" এবং "প্রাইভেট এস্টেট" ডিপার্টমেন্ট হতে মহকুমা ম্যানেজার ও রেভিনিউ সার্কেল অফিসার (কালেকশন) দের চাকুরিতে যোগদানের পূর্বে ২ মাসের রাজস্ব আইন ও সার্ভের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় (ভূঞা, ২০০৪)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি মন্ত্রণালয় ১৯৮৭ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির প্রথম দফার মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর। পরবর্তীতে এই কর্মসূচির মেয়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-১৯৯১ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। কর্মসূচিটি পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৯৩ সালে

"ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" কে রাজস্ব বাজেটে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে নামকরণ করা হয়। সে সময় থেকে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ভবন নীলক্ষেত, ঢাকা এ পরিচালিত হচ্ছে। ভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১২ তলা বিশিষ্ট নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০১৩ সাল হতে এই কেন্দ্র বৃহত্তর পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান দায়িত্বে রয়েছে মহাপরিচালক যিনি যুগ্মসচিব পদমর্যাদার অধিকারী। তাকে সহযোগিতা করে দুইজন উপ-পরিচালক যথাক্রমে– উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। এই কেন্দ্রের মূল কার্যক্রম হল ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে গুণগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রণোদনা প্রদান। কেন্দ্রের ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ হিসেবে কোর্স প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হল ভূমি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত মানবসম্পদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গতিশীল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ (www.landministrybd.com, 2021) ।

২.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরই ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থায় বেশি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় (আলী, ২০০২)। পার্বত্য অঞ্চল মূলত অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং এই অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ও জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয় যা ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি সংস্থা বা দপ্তর। এই কমিশনকে ল্যান্ড কমিশন বলা হয় যার কার্যক্রম এখনো অব্যাহত আছে।

২.৬.১ ল্যান্ড কমিশন

১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তির ৪ ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি। একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ জন সদস্য এই কমিশন গঠিত হয়। এতে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি, সার্কেল চিফ, একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কমিশনের অন্তর্ভূক্ত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এই কমিশনকে যাবতীয় সহায়তা প্রদান করা। ২০০১ সালে ল্যান্ড কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে (www.landministrybd.com, 2021)।

২.৭ ভূমি রাজস্ব হিসাব নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পরিবর্তন

হিন্দু আমলে গ্রামপ্রধান এবং মুসলিম আমলে জমিদারগণ রাজস্ব হিসাব নিকাশ করে থাকত। তবে মোঘল আমলে কানুনগো ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ, ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলি ও প্রথা পদ্ধতি রাজস্ব ধার্য করার সময় সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট ব্যাখ্যা করতেন। বৃটিশ আমলে বোর্ড অব রেভিনিউ এর আওতাধীন জেলা কালেক্টরগণ রাজস্ব হিসাব নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা পরিচালনা করত (হক, ২০১৬)। পাকিস্তান আমলে ১৯৫১ সালে জমিদারি ব্যবস্থা অধিগ্রহণের পর এবং সরকারের খাজনা গ্রহণের ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসার ফলে ভূমি মালিকদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ, হিসাব ঠিক রাখা এবং তাদের আমানত সরকারের হিসাবে ঠিকমত রাখার জন্য তৎকালীন রাজস্ব বিভাগ বিশাল সমস্যায় পরেছিল। এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিসাবরক্ষক-জেনারেলকে রাজস্ব বিভাগ অনুরোধ করে হিসাব গ্রহীতাদের অডিট করার জন্য। হিসাবরক্ষক-জেনারেল তার অক্ষমতা প্রকাশ করে হিসাব গ্রহিতাদের অডিট করার জন্য যেহেতু এটা তার বিধিবদ্ধ নিয়ম-সংক্রান্ত কাজ না। তখন বোর্ড অব রেভিনিউ এবং রাজস্ব বিভাগ হিসাবরক্ষক-জেনারেল ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা করে আভ্যন্তরীণ অডিট সংস্থা ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিভিন্ন রাজস্ব অফিসের হিসাব অডিট করার জন্য যেগুলো খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর একটি অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় (Hasnat et al., 2018)।

২.৭.১ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরঃ

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা যার পদবী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)। তাকে সহযোগিতা করে দুইজন সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক যথাক্রমে– সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (প্রশাসন) ও সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (অডিট)। হিসাব তত্ত্বাবধায়ক, নিরীক্ষকগণ তাদের সহায়তা করে থাকেন। দেশের ৭টি বিভাগে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস রয়েছে (www.landministrybd.com, 2021)। অভ্যন্তরীণ অডিট সংস্থার প্রধান কাজ হল ভূমি মন্ত্রণালয়ের অফিসমূহ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের সাথে জড়িত অফিসসমূহের হিসাবের প্রাপ্তি ও ব্যয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করা। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ও ভাসানটেক প্রকল্পের সময় অনুযায়ী নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। যদি হিসাবে কোনো আর্থিক অসঙ্গতি বা অনিয়ম দেখা যায় তাহলে সেটার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তদারকি করে থাকে (Raihan et al., 2009)।

২.৮ উপকূলীয় ও চরভূমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এর লক্ষ্যে গঠিত প্রশাসন

বাংলাদেশ আমলে ভূমি মন্ত্রণালয় গঠিত হলে ভূমি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। উপকূলীয় ও চরভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

২.৮.১ প্রস্তাবিত উপকূলীয় ও চরভূমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের কাজ হল উপকূলীয় ও চরভূমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। জি আই এস ও রিমোট কন্ট্রোল প্রযুক্তির সহায়তায় উপগ্রহের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করে চর ও উপকূলীয় অঞ্চলের ভাঙ্গণ প্রবণতা, নতুন চর গড়ে উঠার পূর্বাভাস ও নকশা প্রণয়ন এবং ভূমির যথাযথ ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান। চর ও উপকূলীয় অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা। এই পরিদপ্তরের প্রধান হিসেবে একজন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার মহাপরিচালক দায়িত্ব পালন করবে। তাকে সহযোগিতা করবে চারজন উপপরিচালক যথা– হাইড্রোলজি ও কোষ্টাল মারফোলজি, প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং জি আই এস ও রিমোট সেন্সিং (www.landministrybd.com, 2021)।

২.৯ ভূমি হস্তান্তর নিবন্ধন প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন

প্রাচীনকালে ভূমি ব্যবস্থায় ভূমি নিবন্ধন বা ভূমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রশাসন নিয়োজিত ছিল না। মূলত বৃটিশদের আগমনের পর ভূমির জাল-জালিয়াতি রোধ ও রাজস্ব আদায় সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে দলিল নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ১৭৮১ সালে বেঙ্গল স্ট্যাটিউট এর অধীনে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৭৯৩ সালের ৩৬নং বেঙ্গল রেগুলেশনের মাধ্যমে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ সদর স্টেশনে দলিল নিবন্ধনের জন্য রেজিস্ট্রি অফিস স্থাপন করা হয় এবং দেওয়ানি আদালতের রেজিস্ট্রারের উপর দলিল নিবন্ধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৭৯৩ সালের ৩৯ নং রেগুলেশন দ্বারা জেলা সদরে কাজী নিয়োগ করা হয় এবং তাদের সিল ও স্বাক্ষর দ্বারা দলিল সত্যয়ন করা হত (দেবনাথ, ২০১০)। ১৮২৪ সালের ৪ নং রেগুলেশন দ্বারা ডেপুটি রেজিস্ট্রারের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ১৮৩২ সালের ৭ নং রেগুলেশন দ্বারা জেলা বা নগর জজ যিনি নিবন্ধীকরণের দায়িত্বে ছিলেন তিনি একই স্টেশনের সদর আমিনের নিকট হস্তান্তরের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৮৩৮ সালের ৩০ নং আইন দ্বারা সদর স্টেশন ব্যতীত অন্যান্য সিভিল স্টেশনে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস স্থাপন এবং এই অফিস তত্ত্বাবধানের জন্য অফিসার নিয়োগের বিধান করা হয়।

১৮৫১ সালের ১১ নং আইন দ্বারা বাংলার নিম্ন প্রাদেশিক আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণের রেকর্ডপত্রের সাথে রেজিস্ট্রার বহি ও দলিল তত্ত্বাবধানের বিধান করা হয়। ১৮৫৯ সালের ৩ নং আইন দ্বারা ক্যান্টনমেন্ট জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণ দলিল নিবন্ধনের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ সালের ১৬ নং আইন দ্বারা প্রত্যেক নিবন্ধিত দলিলের সংক্ষিপ্তসার রেজিস্ট্রার-জেনারেলের নিকট প্রেরণের বিধান করা হয়। ১৮৬৬ সালের ২০ নং আইন দ্বারা স্থানীয় সরকার দ্বারা কেবল রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিধান করা হয়। ১৮৭১ সালের

৮ নং আইন দ্বারা নিবন্ধিত দলিলের রেকর্ড সংরক্ষণের কার্যালয় হিসেবে রেজিস্ট্রার-জেনারেলের কার্যালয় অবলুপ্ত করে উক্ত কর্মকর্তার পদবি পরিবর্তন করে 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন' নামে তাকে অফিস পরিদর্শন এবং সাধারণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। একই আইনের ৮ ধারাবলে 'নিবন্ধন কার্যালয়সমূহের পরিদর্শক' নিয়োগের বিধান করা হয় (হক, ২০১৬)।

পরবর্তীতে ১৯০৮ সালে (১৯০৮ সালের ১৬ নং) উপমহাদেশের পূর্ণাঙ্গ রেজিস্ট্রেশন আইনের প্রবর্তন হয় এবং এই আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' নামক একজন অফিসার নিয়োগ করার বিধান করা হয়। এছাড়া এই আইনের ৪নং ও ৫নং ধারা অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিধান করা হয়েছিল । পাকিস্তান আমলে এই আইনের ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে এই পদগুলি সৃষ্টির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত বা ভূমি হস্তান্তর নিবন্ধন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশন এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধন কার্যক্রমের ভার প্রদান করায় ভূমি মন্ত্রণালয় নিবন্ধনের কাজ করতে পারে না যার ফলে ভূমি প্রশাসনিক কার্যক্রমে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। বৃটিশ আমলের প্রণীত ১৯০৮ সালের আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট পদ দ্বারাই নিবন্ধন পরিদপ্তরের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই পরিদপ্তরের প্রধান মহাপরিদর্শক নিবন্ধন এর কাজ হল প্রত্যেকটি জেলার রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারদের নিবন্ধন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারক করা। এই পরিদপ্তর মূলত ভূমির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়েই কাজ করে যদিও এটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন (ভূএগ্রা, ২০০৪)।

২.৯.১ জেলা রেজিস্ট্রার

প্রত্যেক জেলায় জেলা রেজিস্ট্রার অফিস রয়েছে এবং জেলা রেজিস্ট্রার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের সকল নিবন্ধন সম্পর্কিত কার্যাবলী তদারক করে এবং দলিল ও নিবন্ধনগুলোর কপি সংরক্ষণ করে থাকে।

২.৯.২ সাব-রেজিস্ট্রার

সাব-রেজিস্ট্রার অফিস প্রত্যেক উপজেলায় রয়েছে। এই অফিস মূলত সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কোন ভূমি হস্তান্তর বিনিময়ের ক্ষেত্রে দলিল করার এক মাসের মধ্যে এই অফিসে নিবন্ধন করতে হয়। সাব-রেজিস্টার অফিস একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভূমির নির্দিষ্ট বিনিময়মূল্য প্রকাশ করে (আলবেরুনী, ২০১৫)।

২.১০ ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় মাঠ প্রশাসনের পরিবর্তন

হিন্দু আমলে ভূমি প্রশাসনের মাঠ প্রশাসন হিসেবে রাজসরকার প্রশাসনের আওতাধীন পঞ্চায়েত ভূমি সম্পর্কিত প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করত এবং গ্রামপ্রধান রাজা বা রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রামবাসীদের থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করত। মুসলিম শাসনামলে ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব দেয়া হয় প্রাদেশিক দেওয়ানের ওপর। এই আমলে রাজস্ব প্রশাসন ও আদায়ের সুবিধার্থে সুবা বাংলাকে কতগুলি সরকার বা জেলায় এবং সরকারগুলি কতগুলি মহাল বা পরগণায় বিভক্ত ছিল (Shafi, 2007)। পরবর্তীতে সরকারের সংখ্যা কমিয়ে সমস্ত সুবাকে কতকগুলি চাকলা বা বৃহত্তর জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। সরকার বা চাকলার প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে আমল্গুজার, আমিল বা ক্রোরী বলা হতো। মহাল বা পরগণার রাজস্ব কর্মকর্তাকে আমিল বা শিকদার বলা হতো। আমিলের দায়িত্ব ছিল তার এলাকার জমিদার, ইজারাদার প্রভৃতির নিকট থেকে সরকারের ধার্য রাজস্ব আদায় করা এবং তা ফোতেদার বা খাজাঞ্চির নিকট সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া। তখন রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব যেমন ছিল মাল্গুজার, ক্রোরী, আমিল, জমিদার, ইজারাদার প্রভৃতির ওপর তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল আমিন, কারকুন, কানুনগো, চৌধুরী, মণ্ডল, পাটওয়ারি ও অন্য জরিপ কর্মচারীদের ওপর (হক, ২০১৬)।

ব্রিটিশ আমলে বোর্ড অব রেভিনিউ বা রাজস্ব বোর্ডের গঠনের পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭০ সালে রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব প্রশাসনের তদারক করার জন্যে প্রতি জেলায় সুপারভাইজার নিয়োগ করেছিল । ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতি জেলার ইংরেজ সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধায়কের পদ পরিবর্তন করে তখন কালেক্টর করা হয় এবং রাজস্ব আদায়ে কালেক্টরকে সাহায্য করার জন্য এদেশী দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে এবং তা তদারক করার জন্য গভর্নর ও কাউন্সিলের চারজন সদস্যকে নিয়ে ভ্রাম্যমান রাজস্ব কমিটি গঠন করা হয়। তবে ১৭৮৬ সালে এই রাজস্ব কমিটি বিলুপ্ত করে বোর্ড অব রেভিনিউ বা রাজস্ব বোর্ড গঠন করা হয় এবং জেলা কালেক্টরকে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৭৭৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় তবে কালেক্টরের দেয়া তথ্যাবলির ভিত্তিতে প্রত্যেক জমিদারের দেয় রাজস্ব ধার্য করারও প্রস্তাব করা হয়। জমিদার বা ইজারাদারগণ কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে জেলা কালেক্টরের নিকট হস্তান্তর করত (Billah, 2017)।

পাকিস্তান আমলে জেলা পর্যায়ে জেলার রাজস্ব কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অতিরিক্ত কালেক্টর (রাজস্ব) নিয়োগ করা হয় এবং কোন কোন জেলায় অতিরিক্ত কালেক্টর (রাজস্ব) এর পরিবর্তে যুগ্ম কালেক্টর (রাজস্ব) নিয়োগ করা হয়। তাকে সহায়তা করার জন্য রাজস্ব ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে কিছুদিন রাজস্ব ডেপুটি কালেক্টরের স্থলে একজন এক্সট্রা এসিসটেন্ট কমিশনার (রেভিনিউ) নিয়োগ করা হয়। এই আমলে মাঠ প্রশাসনের

অন্তর্ভূক্ত জেলা পর্যায়ে ছিল জেলা প্রশাসক (সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সেটেলমেন্ট অফিসার (পদাধিকারবলে), রেভিনিউ এক্সট্রা এসিসটেন্ট কমিশনার ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার (পদাধিকারবলে)। মহকুমা পর্যায়ে ছিল মহকুমা প্রশাসক (সার্বিক তত্ত্বাবধানে), অতিরিক্ত মহকুমা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সেটেলমেন্ট চার্জ অফিসার (পদাধিকারবলে)। থানা পর্যায়ে ছিল সার্কেল অফিসার এবং সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার (পদাধিকারবলে)। বাংলাদেশ আমলে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট এর আওতাধীন বোর্ড অব রেভিনিউ এর বিলোপ সাধন করে কেন্দ্রীয়ভাবে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় গঠন করে রাজস্ব সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব অফিসসমূহ তদারকি ও পরিদর্শন সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভাগীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত ভূমি অফিসে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে (ভূঞা, ২০০৪)।

২.১০.১ বিভাগীয় কমিশনার অফিস:

একটি বিভাগের ভূমি রাজস্ব কার্যক্রম, সংস্কার, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার অফিস দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ অফিসের প্রধান নির্বাহী অফিসার হলেন বিভাগীয় কমিশনার। তিনি তার আওতাধীন জেলা কালেক্টরের অফিস, উপজেলা/থানা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অফিস টু অফিস, উপজেলা/থানা-জেলা-বদলী, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে ক্ষমতা প্রাপ্ত (আলবেরুনী, ২০১৫)।

২.১০.২ কালেক্টরের অফিস (ডিসি অফিস)

জেলা পর্যায়ে কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ও দায়িত্ব কালেক্টরের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তবে প্রতি জেলায় একজন অতিরিক্ত জেলা প্রসাশক (রাজস্ব) রয়েছেন যিনি কালেক্টর বা জেলা প্রসাশকের সার্বিক নির্দেশনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংস্কারে সরাসরি দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। প্রতি জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে সাহায্য করার জন্য একজন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর রয়েছে যিনি জেলার সকল অধস্তন ভূমি ব্যবস্থাপনা অফিসারগণের কাজে তদারক করবেন (Hasan, 2017)।

২.১০.৩ উপজেলা ভূমি অফিস:

উপজেলা পর্যায়ে ভূমি অফিসের প্রধান কর্মকর্তা সহকারী কমিশনার (ভূমি) একটি উপজেলার ভূমি ব্যবস্থাপনায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। তবে তাকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাধারণ তত্ত্বাবধানে স্থানীয়ভাবে এবং কালেক্টর বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হয়। উপজেলা ভূমি

অফিসের কাজ বিশেষ করে খাস জমি ব্যবস্থাপনা, অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায়, নামজারি জমা খারিজ মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি, রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি কাজে সহায়তা করার জন্য একজন কানুনগো নিয়োজিত থাকেন। কানুনগোগণ ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন করে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কার্যক্রম তদারকী করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ।

২.১০.৪ ইউনিয়ন ভূমি অফিস:

দেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন ভূমি অফিস অবস্থিত। আবার কিছু কিছু জেলায় একাধিক ইউনিয়ন নিয়ে একটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস গঠিত হয়েছে। উক্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রধান একজন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা। তাকে সহায়তা করেন একাধিক উপ-সহকারী ও কয়েকজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। পূর্বে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার পদকে তহশীলদার হিসেবে গণ্য করা হত (আলবেরুনী, ২০১৫)।

৩.অধ্যায় পরিশেষ

ভূমি প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রশাসনিক বিবর্তনের ফলস্বরূপ বাংলাদেশ আমলে ভূমি প্রশাসনের পরিপূর্ণ সাংগাঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে । তবে ভূমি ব্যবস্থার সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র ভূমি প্রশাসন গড়ে উঠেনি। ভূমি ব্যবস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ছাড়াও আরো দুটি মন্ত্রণালয় যুক্ত থাকায় ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে (CARE, 2003)। সাধারণ জনগণকে একটি নির্দিষ্ট ভূমি সেবা পেতে বিভিন্ন অফিসে যেতে হয়। তিনটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর ভূমি সেবা দিতে গিয়ে জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি করছে। ভূমি ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র, সুসজ্জিত ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার অভাবে বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে।

অধ্যায় ৪

ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তন

১. সূচনা:

ভূমি ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়নের জন্য ভূমির সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন (Ahammad, 2017)। ভূমি ব্যবস্থার সাথে ভূমি আইন ও প্রশাসনের যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি ভূমি ব্যবস্থাপনার ও সম্পর্ক রয়েছে। মূলত ভূমি ব্যবস্থায় ভূমি আইন ও প্রশাসনের সফলতা নির্ভর করে কার্যকরী ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর। ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অতীতে ভূমির অর্থনৈতিক দিক বেশি বিবেচনা করে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ভূমির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে অর্থনৈতিক দিকের পাশাপাশি পরিবেশগত দিক ও বিবেচনা করা হয় যার ফলে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায়

বেশি জোর দেয়া হয়েছে (Ali, 2011)। এ অধ্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিভাবে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশের ভুমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তনঃ

ভূমি ব্যবস্থাপনা মূলত ভূমি আইন ব্যবস্থা ও ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমি আইন ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থার আবির্ভাব মূলত ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভূমি ব্যবস্থার যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল (Alam et al., 2015)। পরবর্তীতে এই ব্যবস্থাপনা ভূমি ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কার্যবলীকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে পরিবর্তিত হয়েছে। নিম্নে ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছেঃ

২.১ রাজস্ব আদায়ে ভূমি কর ব্যবস্থাপনার বিবর্তন

আর্যপূর্ব ও আর্যযুগ বা হিন্দু আমলে ভূমি ব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহে খাজনা বা কর আদায়ের ব্যবস্থাপনা ছিল না। মুসলিম আমলে প্রথমে (১২০৪-১২০৬) রাজস্ব সংগ্রহ হত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর এবং পরবর্তীতে রাজস্ব নগদ অর্থে আদায় করা হত (Hasnat et al., 2018)। মোঘল আমলে বিঘা প্রতি রাজস্বের হার ছিল আট আনা থেকে বার আনার মধ্যে। কোম্পানি আমলে চব্বিশ পরগণার জমিদারির জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নবাব সরকারের বার্ষিক ২,২২,৯৫৮ টাকা রাজস্ব পরিশোধ করতে হত (হক, ২০১৬)। বৃটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারকে জমির মালিক বলে ঘোষণা করার ফলে এবং জমিদারকে প্রজার সাথে খাজনার চুক্তি করার অধিকার দেয়ার ফলে জমিদার ইচ্ছেমত ভূমিতে খাজনা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা লাভ করে। তবে জমিদার আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা দশভাগ মাত্র পারিশ্রমিক হিসেবে রেখে বাকি অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতো। জমিদারদের বর্ধিত খাজনার ফলে কৃষকদের দুর্দশা লাঘবের জন্যে বৃটিশ সরকার ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন পাশ করে যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমান খাজনার পাট্টা দেয়ার বিধান করা হয়েছিল (Baden-Powell, 1892))। পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানার ভূমিতে রাজস্ব আদায়ে কর প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভর করার বিধান করা হয়েছিল। সেই নিয়মানুযায়ী রাজস্ব বিভাগ কালেক্টরদের মাধ্যমে কৃষকের নিকট থেকে খাজনা বা কর আদায় করত । বাংলাদেশ আমলে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ জারি হয় ১৯৭৬ সালে যা কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে সংশোধন করা হয়েছিল। ভূমিকে কৃষি ও অকৃষি এই দুভাগে ভাগ করে কর আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে

৮.২৫ একরের অধিক কৃষি জমির উপর ২/- টাকা হারে কর আরোপ করা হয়েছে । এছাড়া শিল্প, ব্যবসা ও অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির উপর ও বিভিন্ন হারে কর আরোপ করা হয়েছে (Hasnat et al., 2018) ।

২.২ ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

হিন্দু আমলে ভূমি জরিপ ব্যবস্থা নির্ভর করত ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের উপর। প্রাচীন বাংলার লিপিগুলোতে ভূমি মাপ বা জরিপের উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে ভূমিতে উৎপন্ন শস্য বা ফসলের মাধ্যমে তিনভাগে ভূমি মাপ করা হত যথাক্রমে: কূল্যবাপ, দ্রোনবাপ ও আড়বাপ। এই তিনভাগের জমিকে মাপা হত নলের সাহায্যে যা প্রাচীন বাংলার প্রচলিত মানদণ্ড ছিল (হক, ২০১৬)। মুসলিম আমলে শেরশাহ সর্বপ্রথম ভূমিতে জরিপ ব্যবস্থাপনায় কাজ করে। পরবর্তীতে আকবরের শাসনামলে টোডরমল রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় আবাদি ও অনাবাদি জমির পরিমাপ করা হয়েছিল । এছাড়া শাহ সুজা ও মুর্শিদকুলী খানও রাজস্ব জরিপের মাধ্যমে ভূমি জরিপ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী লাভের পর জেমস রেনেল বাংলার নদী পথের একটি মানচিত্র তৈরি করেন এবং বৃটিশ ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে ব্রিটিশ সরকারের আমলে রেনেলের নদীপথের জরিপ মূল্যবান হলেও ভূমি রাজস্ব সম্পর্কিত বিষয়ে 'আইনগত গ্রহণযোগ্যতা' বিষয়ে স্বীকৃতি পায়নি (গাঙ্গুলী, ২০১২)। ১৮২২ সালে বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেলম্যান্ট রেগুলেশন এর ৬ ধারা অনুযায়ী কালেক্টরগণ জরিপ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যা থাকবাস্ত জরিপ নামে পরিচিত। ১৮৪৬ হতে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত থাকবাস্ত জরিপ পরিচালনা করা হয় যার মাধ্যমে জমিদারি সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। থাকবাস্ত জরিপে জমিদারিগুলির সীমানা নির্ধারিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন মৌজার বা পরগণা নির্ধারণ না হওয়ায় নবসৃষ্ট জমিদারি বা আংশিক বিক্রি এস্টেট বা জমিদারি সীমানা বহির্ভূত জঙ্গল, পতিত ও আবাদি ভূমি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়লে কালেক্টরগণ রাজস্ব জরিপ শুরু করেন ১৮৪৬ সালে (দেবনাথ, ২০১০)। পরবর্তীতে বঙ্গীয় জরিপ আইন ১৮৭৫ প্রণয়ন করা হয় ভূ-সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ রোধসহ ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং ভূমির সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ হ্রাস, সীমানা চিহ্ন স্থাপন ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে। ১৮৮৮ সালে কক্সবাজার জেলার রামু থানায় সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক কিস্তোয়ার বা ক্যাডস্ট্রাল জরিপ সফলতার সাথে পরিচালিত হয় যার মাধ্যমে দেশের সকল জেলায় পর্যায়ক্রমে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয় (Azad & Uddin, 2012)। তবে ১৯৪০ সালে ক্যাডেস্ট্রাল জরিপে পরিসমাপ্তি হয় যার ফলে সারাদেশে জরিপ কার্যক্রমেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। এই জরিপ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় বড় পরিবর্তন আসে কারণ ভূমি মালিকদের প্রত্যেক ভূমির মৌজা ম্যাপসহ, সম্পূর্ণ খতিয়ান যাতে খতিয়ান নং, মৌজা নং, জুরিশডিকশন লিস্ট নং, ভূমির ধরণ, জাত,অর্পিত রাজস্বের পরিমান ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবরতীতে সি,এস জরিপে প্রণীত নকশা ও খতিয়ান সংশোধন পূর্বক ভূমি মালিকানা রেকর্ড হালকরণের

লক্ষ্যে এক সংশোধনী জরিপ কর্মসূচি গ্রহণ করে যা রিভিশনাল সার্ভে বা সংশোধনী জরিপ নামে পরিচিত। এই জরিপ চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় পরিচালিত হয়েছিল (ভূঞা, ২০০৪)।

পাকিস্তান আমলে বৃটিশ সরকারের ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ সংশোধন করা হয়। তবে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ১৯৫০ প্রণীত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ জরিপ (এস,এ) শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সালে যার মাধ্যমে জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। এছাড়া সি,এস জরিপের ভুলগুলো সংশোধনের লক্ষ্যে সংশোধন জরিপও পরিচালিত হতে থাকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। এই আমলে এস,এ জরিপকে পাকিস্তান জরিপও বলা হত। বাংলাদেশ আমলে তিন ধরনের ভূমি জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যেমনঃ সংশোধন জরিপ যা ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে, বাংলাদেশ জরিপ যা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫০ এর ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সারাদেশে পরিচালিত হয় ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এবং শহর জরিপ যা ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরে পরিচালিত হয়েছিল। এটাই ছিল বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত নতুন জরিপ (Hasnat et al., 2018)।

২.৩ ভূমি রেকর্ডিং ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

ভূমি রেকর্ডিং ব্যবস্থায় মূলত বাংলাদেশ আমলে বেশি পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে প্রাচীন আমল থেকেই ভূমি ব্যবস্থায় রেকর্ডিং ব্যবস্থাপনা ছিল যা সময়ের পরিক্রমায় কার্যকরী ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু যুগের গুপ্ত আমলে ভূমির সীমা, স্বত্ব, অধিকার, বিভাগ অর্থাৎ জরিপ সমন্ধীয় সমস্ত সংবাদ ও হিসাব সংগ্রহ করে তা রক্ষা করা এবং প্রস্তুত রাখা ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ থাকতো তালপাতায় বা ঐ জাতীয় কোনো বস্তুর ওপর (নওয়াজ, ২০১৪)। মুসলিম আমলে শেরশাহ ভূমি ব্যবস্থাপনার রেকর্ডিং ক্ষেত্রে পাট্টা ও কবুলিয়ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। পাট্টায় মূলত ভূমির সম্পূর্ণ তথ্যাবলী যেমন- সীমানা, ক্ষেত্র, শ্রেণি, রাজস্ব, মালিকের অধিকার এবং ভূমিতে অধিকারের শর্তাবলী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হত। যেসকল কৃষক জমিদারদের দ্বারা পাট্টায় বর্ণিত সকল শর্তাবলী মেনে নিত, তাদের ভূমি গ্রহণযোগ্যতার একটি পত্র প্রদান করা হত যা কবুলিয়ত নামে পরিচিত ছিল। এই পাট্টা ও কবুলিয়ত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের জমিতে মালিকানার অধিকার ও ভোগদখল অর্জন করতে পারত। এ আমলে কানুনগো নিয়োগ করা হয়েছিল ভূমি জরিপ ও রেকর্ডিং ব্যবস্থাপনার জন্য। তাছাড়া কৃষি ভূমির নকশা ও প্লটের রেকর্ড প্রস্তুতকরণ বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়েছিল (Miah, 2006)। মুসলিম আমলের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭৭ সালে শহর ও গ্রামে ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য কানুনগো নিয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, ১৭৮১ সালে কানুনগোদের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে ১৭৯৩ সালে কানুনগো পদ বিলুপ্ত করা হলে গ্রামীণ এলাকার ভূমি রেকর্ডের দায়িত্ব জেলা কালেক্টরের ওপর অর্পিত হয় এবং শহরের ভূমির

রেকর্ড রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৮০ সালের ৮ নং রেগুলেশনের মাধ্যমে কালেক্টরেট অফিসে প্রত্যেক জমিদারির জন্য তৌজি রেজিস্টার পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যারা ভূমির জরিপ, নির্দিষ্ট ভূমিতে কর আরোপ ও রাজস্ব সংগ্রহ লিপিবদ্ধ করত নিবন্ধন গ্রন্থে (ইসলাম, ২০১২)।

বৃটিশ আমলে ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন অনুযায়ী জমিদারগণ রায়তদের পাট্টা প্রদান করত। এই পাট্টায় জমি, জমির পরিমান ও স্বত্বদখলের শর্তাবলী উল্লেখ থাকত। এই আমলে ১৮৭৫ সালের জরিপ আইন ও ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী ভূমির মৌজার নকশা ও খতিয়ান প্রস্তুত করার বিধান করা হয়েছিল। এই খতিয়ানে মূলত ভূমির খতিয়ান নং, ভূমির পরিমান, মৌজা নাম, মৌজা নং, প্লট নং, মালিকদের নাম ও অংশ, তাদের স্বত্বের অধিকার ও ভোগদখল লিপিবদ্ধ করা হত। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৩ নং ধারা অনুযায়ী ভূমি রেকর্ড ও নকশা প্রণয়ন হালনাগাদ করার বিধান করা হয়েছিল। এছাড়া সংশোধনী জরিপ ও পাকিস্তান জরিপের মাধ্যমেও খতিয়ান প্রস্তুত ও সম্পন্ন করার কাজ হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিন ধরনের খতিয়ান এর কাজ হয়েছিল যেমন: সংশোধনী জরিপ খতিয়ান (১৯৬৫-১৯৯৭), বাংলাদেশ জরিপ খতিয়ান (১৯৮৫ সাল পর্যন্ত) , শহর জরিপ খতিয়ান (১৯৯৯-২০০০) শুধুমাত্র ঢাকা শহরের জন্য (Hasnat et al., 2018)।

২.৪ ভূমি নামজারি ও জমা খারিজ ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

১৭৯৩ ও ১৭৯৭ সালের রেগুলেশনে এবং সর্বশেষ ১৮০০ সালের ৮ নং রেগুলেশনে কালেক্টরের কার্যালয়ে জেলার জমিদারি, স্বাধীন তালুক, রাজস্ব প্রদেয় ভূমি ও লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি নিবন্ধন করার জন্যে নিয়মাবলি প্রণীত হয়েছিল। ঐ নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা কালেক্টরের কার্যালয়ে পত্যেক পরগণার তৌজি রেজিস্ট্রার বা তৌজি নিবন্ধন গ্রন্থ রাখা হতো (ভূঞা, ২০০৪)। তৌজি রেজিস্ট্রার বা তৌজি নিবন্ধন গ্রন্থে জেলার প্রত্যেকটি পরগণার জমিদারি, স্বাধীন তালুক,রাজস্ব প্রদেয় ভূমি ও লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমির তপসিল বিবরণ, ধার্য জমার বিবরণ, জমিদার, তালুকদার, ভূমির মালিক ও লাখেরাজদের নাম, ধাম, স্বত্ব ও পরিমাণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকতো। উক্ত নিবন্ধন গ্রন্থে জমিদারি, স্বাধীন তালুক, রাজস্ব প্রদেয় ভূমি বা লাখেরাজ ভূমির ক্রমিক নম্বরকে তৌজি নম্বর বলা হত। জমিদারি, স্বাধীন তালুক, রাজস্ব প্রদেয় ভূমি বা লাখেরাজ ভূমির অংশ বা সম্পূর্ণ হস্তান্তরিত হলে বা জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যাধিকারী বা লাখেরাজদের মৃত্যুতে তা তার উত্তরাধিকারীর নাম কালেক্টরের কার্যালয়ে জানাতে হতো এবং কালেক্টরের আদেশ অনুযায়ী তখন তৌজি নিবন্ধন গ্রন্থ সংশোধন করা হতো। ঐরূপ সংশোধন করাকে নামজারি বলা হত (হক, ২০১৬)। তাছাড়া জমিদারি, স্বাধীন তালুক, রাজস্ব প্রদেয় ভূমি অংশ হারে বণ্টন হলে যে কোনো অংশীদারের আবেদনক্রমে ১৮০১ সালের ১ নং রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী কালেক্টর তাদের মধ্যে অংশ

হারে সদর জমা ভাগ করে দিয়ে তৌজি সংশোধন করতেন। ঐরূপ জমা ভাগ করাকে জমা খারিজ বলা হতো। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৭ ধারা অনুসারে থানা রাজস্ব কর্মকর্তাদের নামজারি করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে স্মারক দ্বারা নামজারি ও খতিয়ান হালকরণের জন্যে নির্দেশাবলি জারি করা হয় যার ফলে স্থানীয় তহসিলদারগণ থানা রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট ভূমি মালিকের মৃত্যু হলে ঐ মালিকের ওয়ারিশগণের নামজারির দরখাস্ত পেশ করার জন্য নোটিশ প্রদান করাসহ নামজারির সকল কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা সঠিকভাবে প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে নামজারির ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দিলে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট অধস্তন রাজস্ব কর্মকর্তাদের বোর্ডের নির্দেশ প্রার্থনা করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল (আলবেরুনী, ২০১৫)।

২.৫ খাস জমি ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

বৃটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহির্ভূত বেশিরভাগ জমি সরকারের খাস মহাল/জমি হিসেবে পরিগণিত হত। মূলত সরকারের দখলে থাকা জমি যেমন: পতিত জমি যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়নি, বড় বড় নাব্য নদীতে উত্থিত চর জমি, লাখেরাজ জমি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া জমি যা পরবর্তীকালে সরকারের দখলভুক্ত হয়েছে সবই খাস জমি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ আমলে খাস জমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল (হক, ২০১৬)। খাসজমি সংক্রান্ত যেসকল আইন এ আমলে প্রণীত হয়েছিল তা হলো: বেঙ্গল রেগুলেশন XI ১৮২৫, বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন অ্যাক্ট ১৮৬৮, সরকারি এস্টেট ম্যানুয়াল ১৯১৯, বেঙ্গল ক্রাউন এস্টেট ম্যানুয়াল ১৯৩২ (Barkat et al., 2000)। পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণ সীমা বহির্ভূত ভূমি খাস জমি হিসেবে ভূমিহীন কৃষকের মাঝে বিতরণ করার বিধান করা হয়েছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পূর্বে সকল খাস জমির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল জেলা কালেক্টরের অধীনস্থ সরকারের খাসমহাল তহসিলদারগণ। খাস জমি বিতরণে শুধু মোহাজেরদের অগ্রাধিকার দেয়া হয় (Barkat, 2001)। খাস জমি বরাদ্দ নীতিতে বিনামূল্যে জমি বরাদ্দ করার বিধান ছিল না তবে কিস্তিতে জমির মূল্য প্রদানের বিধান করা হয়েছিল। এতে ভূমিহীন কৃষকের সামর্থ্য না থাকায় অনেকেই খাস জমি পেত না এবং জোতদার শ্রেণিই অধিকাংশ খাস জমির মালিকানা লাভ করে। এই আইনের মাধ্যমে কৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমা ৩৩.৩ একর করা হয় এবং অতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট হস্তান্তরের বিধান হয়। তবে সিলিং নির্ধারণ করা হলেও খাস জমির পরিমান আশানুযায়ী কম ছিল (Barkat & Zaman, 2002)। বাংলাদেশ আমলে ১৯৭২ সালে জমির সিলিং ৩৩.৩ একর থাকলেও ১৯৮২ সালে ২০ একর করা হয়েছিল (Hossain, 2015)। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে সরকার অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতি জারি করে যার মাধ্যমে শহুরে এলাকায় খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত কতজমি বিতরণ করা হয়েছে এর সরকারী রেকর্ড নেই বিধায় এই নীতিমালা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং

সরকারেরও আগ্রহের ঘাটতি ছিল এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। ১৯৯৭ সালে খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা জারি করা হয় যার মাধ্যমে খাস জমি ৯৯ বছরের জন্য বণ্টন করার অনুমদন দেয়া হয় (অস্থায়ীভাবে ১ বছরের জন্য) । এই নীতিমালায় হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা জমি, রাষ্ট্রের অন্যান্য ধরনের কৃষি জমি যেমন সমুদ্র বা নদী থেকে নতুন উদ্ভূত জমি পুনরুদ্ধার করা, সরকারি নিলামে অধিগ্রহণকৃত জমি, পরিত্যক্ত বা বাজেয়াপ্ত জমি খাস জমি হিসেবে বরাদ্দের অনুমোদন হয়। ভূমিহীন পরিবারকে কৃষি খাস জমি বণ্টন করা হয় এবং ১ থেকে ৩ বছরের সময়ের জন্য সমবায়কে খাস জলজ জমি বণ্টন করার বিধান প্রণীত হয় (Das et al., 2012)। বর্তমানে খাস জমির পরিমান কত রয়েছে তার সঠিক তথ্য নেই। তবে খাস জমির ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমি মন্ত্রনালয়ের অধীনে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এবং খাস জমি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে জেলে প্রশাসক, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং তহসিল অফিস জড়িত থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনীতিবিদগণ ভূমি প্রশাসন ও কর্মকর্তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে খাস জমি দখলের ক্ষেত্রে (Feldman & Geisler,2011)। যার ফলে অনেক ভূমিহীন মানুষ খাস জমি পেতে ভোগান্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে (Barkat et al., 2000)।

২.৬ জলমহাল, চিংড়িমহাল, পাথরমহাল, বালুমহাল ও চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্র অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন মহালের ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা রয়েছে। তবে সরকারের এ আইনের ফলে জলমহাল ও অন্যান্য মহালের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার নির্দেশনার অভাব ছিল। বাংলাদেশ আমলে ১৯৭৩ সালে সরকার জলমহাল বন্দোবস্তের সংশোধিত নীতিমালা ঘোষণা করে যার মাধ্যমে সমবায় সমিতির নিকট বদ্ধ জলমহাল তিন বছরের জন্য এবং উন্মুক্ত জলমহাল এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে (এএলআরডি, ২০১৪)। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে হাট, বাজার, ফেরি, ডোবা/পুকুর ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদির নিকট হস্তান্তর করার নীতি ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪ সালে সরকার বদ্ধ জলমহালসহ অন্যান্য জলমহালগুলো মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের (উপজেলা পরিষদ, মৎস্য ও পশুপালন বিভাগ, জেলা প্রশাসন) ব্যবস্থাপনায় বন্দোবস্ত দেয়ার নীতি ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৮৫ সালে সরকার সরাসরি মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা দেওয়ার নীতি জারি করা হয়। জনগনের কল্যাণে সরকার জলাশয়গুলো সর্বসাধারনের ব্যবহারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়ার নীতি ঘোষণা করে ১৯৮৭ সালে (হক, ২০১৬)। ১৯৮৮ সালে মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিসমূহের সত্যতা যাচাই করে তাদের মধ্যে জলমহাল নিলামে বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি সংস্কার কমিটি কর্তৃক জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও জেলা ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির নিকট সুপারিশ করার এবং সুপারিশকৃত সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়ার

নির্দেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে পাথর ও বালু মহালগুলো ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা কালেক্টর কর্তৃক বন্দোবস্ত দেয়ার নীতি বহাল রাখার কথা ঘোষণা করা হয়। চিংড়িমহালের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার নীতি ১৯৮৬ সালে প্রণীত হয় এবং পরবর্তী বছর ১৯৮৭ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষাপযোগী খাস জমি নতুন করে বরাদ্দ নয়া দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (আলবেরুনী, ২০১৫)। এসব মহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সমাজের ধনী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ভূমি প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এসব মহাল কুক্ষিগত করে রাখে। যার ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ক্ষুদ্র জমির মালিক, দরিদ্র মৎস্যজীবীরা জলমহাল ও চিংড়িমহালের ইজারা ভূমি প্রশাসন থেকে পায় না। এছাড়া এই প্রভাবশালী মহাল আইনকে অমান্য করে পাথরমহাল ও বালুমহাল এর ওপরও অবৈধভাবে দখল করে রাখে। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই (বারকাত, ২০১৬)।

২.৭ অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা মূলত পাকিস্তান আমল থেকে শুরু হয়েছে (Siddique, 1997)। বৃটিশ আমলের পরবর্তী উপমহাদেশে যুদ্ধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দুই দেশের আবির্ভাব ঘটে এবং এক দেশের লোক অন্য দেশে পদার্পণ করায় অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তির উদ্ভব হয়। পাকিস্তান আমলের পর বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উদ্ভব হয়। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে অনেক লোক বিশেষ করে সংখ্যালঘুরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি ফেলে দেশ ত্যাগ করায় অথবা তাদের সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ফলে সৃষ্ট অবস্থা দূরীকরণের জন্যে তৎকালীন প্রাদেশিক আইন সভা ১৯৫১ সালের উদ্বাস্তু সম্পত্তি (দখল পুনরুদ্ধার) আইন এবং উদ্বাস্তু (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) আইন প্রণয়ন করেছিল (আলবেরুনী, ২০১৫)। এ আইনের ফলে দাঙ্গার সময় যেসকল স্থাবর সম্পত্তির মালিক তাদের সম্পত্তি হতে দখলচ্যুত হয় তাদের দখল ফেরত দেয়ার অর্থাৎ অবৈধ দখলকারীকে তা থেকে উচ্ছেদ করে প্রকৃত মালিকের দখলে তা প্রত্যর্পণ করার এবং শেষোক্ত আইনের মাধ্যমে যেসকল মালিক দেশে ফেরত না এসে তাদের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তাদের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্যে বিধান করা হয়েছিল। মূলত যে সকল উদ্বাস্তু তাদের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আবেদন করতো শুধু সেসকল মালিকের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতো । ১৯৬৪ সালেও উপদ্রুত ব্যক্তি (পুনর্বাসন) অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে দখলচ্যুত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পত্তি তাদের দখলে প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান প্রতরক্ষা বিধিমালার ১৬৯ নং বিধিতে যেসকল ভূমি ও দলান শত্রু সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখ আছে তা শত্রু সম্পত্তির

ডেপুটি কাস্টডিয়ানের (ভূমি ও দালানসমূহের) নিকট ন্যস্ত হয়েছে মর্মে আদেশ প্রদান করা হয়েছিল (হক, ২০১৬)।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের ফলে ভারতের অধিবাসী যারা পাকিস্তানে বসবাস করতো তাদের পাকিস্তানে অবস্থিত সকল সম্পত্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু অধিবাসী ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করে সাময়িকভাবে ভারতে অবস্থান করেছিল তাদের পাকিস্তানে অবস্থিত যাবতীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সরকার নিযুক্ত কাস্টডিয়ান বা জিম্মাদারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কাস্টডিয়ানের ওপর শত্রু সম্পত্তি ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং ১৯৬৯ সালে শত্রু সম্পত্তি অধ্যাদেশ জারি করে ঐ সকল সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কাস্টডিয়ানের ওপর বহাল রাখা হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্যে ডেপুটি কাস্টডিয়ান সময়ে সময়ে জেলা প্রশাসক এবং এসিস্ট্যান্ট কাস্টডিয়ান বা সহকারী জিম্মাদারের নিকট নির্দেশাবলি পাঠাতেন এবং ঐ সকল নির্দেশাবলি অনুসরণ করে সহকারি জিম্মাদার সেসব সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করতেন (এএলআরডি, ২০১৪)।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ১৯৬৯ সালে শত্রু সম্পত্তি রহিতকরণ আইন প্রণয়ন করে কাস্টডিয়ানের ওপর ন্যস্তকৃত সম্পত্তি সরকারের ওপর ন্যস্ত হওয়ার বিধান করা হয়েছিল এবং অবৈধ দখলদারের নিকট থেকে সকল অনিবাসী ও শত্রু সম্পত্তির দখল উদ্ধারের বিধান করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ডেপুটি কাস্টডিয়ান সকল জেলার সহকারী কাস্টডিয়ানদের অবগত করে যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পরে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে যারা দেশ ত্যাগ করেছিল তারা ছাড়া যে সকল ব্যক্তির সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ডেপুটি কাস্টডিয়ানে ন্যস্ত ছিল সেসব সম্পত্তি বৈধ মালিকের নিকট দখল ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ব্যতীত কোনো শত্রু সম্পত্তির দখল না নেয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে সকল শত্রু সম্পত্তি আইন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র দ্বারা খারিজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরপর ১৯৭৭ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বিলি বন্দোবস্ত করার নির্দেশাবলি জারি করা হয়েছিল যেখানে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি জমি, পতিত অকৃষি জমি, বাড়িঘর ইত্যাদি কিভাবে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় বন্দোবস্ত দেয়া যাবে তা উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৮, ১৯৮৯ সালে অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন স্মারক প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পত্তি রহিতকরণ আইন বাতিল করে ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন এর মাধ্যমে এবং এসকল তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মালিকদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের নিকট অবমুক্তির জন্য আবেদন করার বিধান করা হয়েছিল (হক, ২০১৬)। পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যেসকল অবাঙ্গালি ও

বাঙ্গালি দালাল পাকিস্তান বাহিনিকে সহযোগিতা করেছে এবং দেশ স্বাধীন হবার পর দেশ ত্যাগ বা আত্মগোপন করেছিল তাদের সকল সম্পত্তিকে বিবেচনা করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে সরকার এসকল সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৭২ সালে বিধিমালা জারি করেছিল। সর্বশেষ ১৯৮৮ সালে অর্পিত সম্পত্তির ন্যায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় ভূমি প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে পরিত্যক্ত সম্পত্তির যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশবলী জারি করা হয়েছে (বারকাত, ২০১৬) ।

২.৮ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

আর্যপূর্ব যুগে মানুষ ভূমি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ভূমিতে জুম চাষ শুরু করে। তখন মানুষ অনুপাতে ভূমি পর্যাপ্ত ও সহজপ্রাপ্য ছিল বিধায় ভূমিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারত। জুম চাষ করে যে উৎপাদন হত তা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল বলে তারা সমতল ভূমিতে চাষাবাদের প্রয়োজন অনুভব করেনি। আর্যযুগের শুরুতে মানুষ পশুপাখি লালন-পালন এবং হস্তশিল্পের কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমতল ভূমিতে কৃষিকাজ শুরু করে। কৃষিকাজের আরম্ভের পরই মানুষ ভূমির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে (Hasnat et al., 2018)। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূমির ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভূমিতে মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দু আমলে ভূমির চাহিদা ও মূল্য নির্ধারিত হত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের পরিমান ও উৎপাদন ক্ষমতার ওপর (হক,২০১৬) । মুসলিম আমলে ভূমির ব্যবহার শুধু কৃষিকাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃটিশ আমলে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থায় ভূমির উচ্চফলনশীলতাকে বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। শুষ্ক ও আদ্র মৌসুমে ভূমির সঠিক ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল (Swamy, 2010)। পাকিস্তান আমলেও বিভিন্ন মৌসুমে ভূমির যাতে সঠিক ব্যবহার হয় এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে জোর দেয়া হয়েছিল। এ আমলে ভূমিকে সম্পদ হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করায় মানুষ বেশি সচেতন হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও কল-কারখানা স্থাপনে ভূমির ব্যবহার বাড়তে থাকে এবং মানুষের মধ্যে ভূমি ব্যবহার নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হতে থাকে (Islam et al., 2015)। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আমলে ফসলি ও অ-ফসলি ভূমিকে বিভক্ত করে ভূমির সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে পরিবেশ সংরক্ষণ, নগর বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করা, পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা, জমির ব্যবহারের বিরোধগুলি রোধ করা এবং দূষণকারীদের সংস্পর্শ হ্রাস করা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে ২০০১ সালে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় (সরকার, ২০২০)। এই নীতিমালা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি ভূমি অকৃষি খাতে অধিক ব্যবহারকে হ্রাস করার জন্য প্রণয়ন করা হলেও ভূমির যথার্থ ব্যবহার ব্যবস্থাপনা এখনও পর্যন্ত বাস্তাবায়ন হয়নি। এই নীতিমালার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ছিল যেমন: ভূমির ব্যবহারভিত্তিক

জোন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিস্তারিত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত না করা, অধিগ্রহণকৃত ভূমি মূল মালিকের কাছে ফেরত দেবার বিধান সম্পর্কে আলোচনা নয়া করা ইত্যাদি (বারকাত, ২০১৬)।

২.৯ ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

ব্রিটিশ আমলে ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে ভূমি হুকুম দখল ও অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে ১৯৪৮ সালের (জরুরি) সম্পত্তি হুকুম দখল আইন জারি করে জনস্বার্থে বা জনকল্যাণে যেকোনো গৃহাদি বা জমি হুকুম দখল ও অধিগ্রহণ করার বিধান করা হয়েছিল। এরপর ১৯৫৯ সালে হাট বাজার অধ্যাদেশ জারি করে সরকারের খাস জমিতে কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত হাট-বাজার স্থাপিত হলে অধিগ্রহণ ও দখল পুনরুদ্ধারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল (ভূঞা, ২০০৪)। বাংলাদেশ আমলে সরকার উপর্যুক্ত (জরুরি) সম্পত্তি হুকুম দখল আইন দুটি বাতিল করে দিয়ে ১৯৮২ সালে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৯ সালের সম্পত্তি জরুরি অধিগ্রহণ আইন জারি করেছিল স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের জন্য। এ আইন অনুযায়ী ধর্মীয় উপসনালয়, কবরস্থান ও শ্মশান হিসেবে ব্যবহৃত কোনো সম্পত্তি ভিন্ন যেকোনো সম্পত্তি সরকারের নির্দেশ ও পূর্বানুমোদনক্রমে জনকল্যাণে জেলা প্রশাসক লিখিত আদেশ দ্বারা জরুরি ভিত্তিতে অধিগ্রহণ করতে পারবেন। ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ এবং অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান বেশি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ২৩ শে মে তারিখের স্মারকে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণের পরিমান সাময়িক ক্ষতিপূরণের পরিমান থেকে ২০% এর বেশি হলে এবং তা কেন করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তার দেয়া কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হলে সেই দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (হক, ২০১৬)। এরপর ১৯৭৫ সালের ১০ মার্চ তারিখের স্মারকে কোনো জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্যে সঠিক বিক্রয়মূল্য না জানা থাকলে বিভিন্ন জমির ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন শতাংশ হারে ক্ষতিপূরণ ধার্য করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে হুকুম দখলকৃত জমির গাছপালার ক্ষতিপূরণ জমির মালিকের ইচ্ছানুযায়ী মূল্য না হলে অধিগ্রহণ করা জমির দখল বুঝিয়ে দেয়ার সময় ঐ সকল গাছপালা মালিককে কেটে নেয়ার সুযোগ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ২৫ শে জানুয়ারি তারিখের স্মারকে দশ বিঘার অতিরিক্ত জমি হুকুম দখলের জন্যে কোনো প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা যথাযথ কাগজপত্রসহ রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্যে পাঠাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ১৯৯১ সালে অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রমাণিত হলে যে কর্মকর্তা ঐ ভূমি অধিগ্রহণের জন্যে চাহিদাপত্র দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (MOL, 1991)।

২.১০ আদিবাসীদের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিবর্তন

যুগ যুগ ধরে আদিবাসীরা পাহাড়ে তাদের নিজস্ব সামাজিক পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবহার করে আসছে। বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার প্রচলিত আইনের চেয়ে আদিবাসীদের ভূমি মালিকানার ধরন ভিন্ন । তাদের ভূমি মালিকানা বংশপরাম্পরা অনুযায়ী সামাজিক ও মৌখিকভাবে নির্ধারণ হয়ে থাকে। তবে সমতলের আদিবাসীদের ভূমির মালিকানা দেশের প্রচলিত আইনে নির্ধারণ করা হলেও মূলত তিন পার্বত্য জেলায় আদিবাসীদের ভূমি মালিকানা সামাজিক। তাদের ভূমি মালিকানার ভিত্তি হিসেবে 'সার্বজনীন সম্পদ-সম্পত্তি মালিকানা অধিকার' নীতি প্রচলিত আছে। ফলে এই মালিকানা বংশ পরম্পরায় মৌখিক (বারকাত, ২০১৬) । ব্রিটিশ শাসনামলেই পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য "চিটাগাং হিলট্র্যাকটস রেগুলেশন অ্যাক্ট" নামে আলাদা ভূমি আইন করা হয়। সেই আইনে একই ধরনের স্বীকৃতি দেয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে আদিবাসীদের ভূমি ব্যবস্থাপনায় অনেক পরিবর্তন আসে। আশ্চর্যজনকভাবে তারা তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হন এবং ভূমির অধিকার হতে বঞ্চিত হতে শুরু করে। বাংলাদেশ আমলে ১৯৭১ এবং ১৯৮৯ সালে আইনের পরিবর্তন করে বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয় যা হিলট্র্যাক্টস রেগুলেশনের বিরোধী (হক, ২০১৬)। জিয়াউর রহমানের সময় দেশের অন্যান্য জেলার মানুষকে আদিবাসীদের ভূমি বন্দোবস্তের সুযোগ করে দেয়া হয়। ফলে ওই সময় অন্য জেলা থেকে সাড়ে চার লাখ মানুষ পাহাড়ে আসে। পরবর্তীতে, ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে ছয় মাসের মধ্যে বিধি প্রণয়নের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভূমি কমিশনের মিটিং এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এখনো অনেক জটিলতা রয়েছে (পলাশ, ২০২০)। আদিবাসীদের ভূমির ব্যবস্থাপনা তিনটি সার্কেলের আওতায় পার্বত্য পাড়ার হেডম্যান এবং কারবারিরা করে থাকেন। তবে পাহাড়িদের নিজস্ব হেডম্যান ও কারবারি প্রথার মাধমে মৌখিক ভূমি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি জেলা পরিষদ এবং বিভাগীয় কমিশনারও পার্বত্য ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত। এই ব্যবস্থাপনায় মূল দায়িত্ব হেডম্যান ও কারবারিদের ওপর কারণ তাদের অনুমোদন ছাড়া পার্বত্য জেলার ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। তবে এই আইন অমান্য করে বাণিজ্যিকভাবে এবং প্রভাবশলীরা বন্দোবস্তের নামে পাহাড়ের জমি দখল করছে (স্বপন, ২০১৭)।

২.১১ ম্যানুয়াল ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ও ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় ম্যানুয়াল ভূমি ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তন করে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন মূলত বর্তমান সরকার গৃহীত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রেজিস্ট্রেশন আধুনিকায়ন টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ২০০৮ সালে হয়েছে। দেশের ভূমি ব্যস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং দক্ষ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষে ডিজিটাল ভূমি

ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছে তবে নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর, খতিয়ান ও পর্চা, জরিপ এবং জমির ম্যাপ সম্পর্কিত কাজগুলোতে ইতোমধ্যে ডিজিটাল সেবা দিচ্ছে। ম্যানুয়াল ভূমি ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে যার দরুণ সরকার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় ওপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে (Talukder et al., 2014)। জনগণের সময়, অর্থ ও ভোগান্তি নিরসনে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সকল উপজেলা ভূমি অফিস ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় ভূমি নামজারির সেবা প্রদান করছে। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত নিবন্ধন অধিদপ্তর একসঙ্গে সমন্বিত হয়ে নামজারি এবং খতিয়ানের ডাটাবেজ তৈরি করেছে। ই-নামজারির জন্য আধুনিক ফর্ম চালু করা হয়েছে এবং সেবাপ্রত্যাশী নাগরিক নিজে এই ফর্ম ঝামেলামুক্তভাবে আবেদন করতে পারবে (Rabbi, 2019)। কারণ জমির যেসব ডকুমেন্ট সরকারের কাছে সংরক্ষিত আছে তার কোনো কপি সেবা প্রত্যাশীকে নামজারি আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে না এবং নিবন্ধন দলিলমূলেও নামজারি করা হবে। ফলে জমি হস্তান্তরে নতুন করে নামজারির প্রয়োজন হবে না। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা মূলত জমির মালিকানা হস্তান্তরের ভোগান্তি হ্রাসে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে (Saif & Howlader, 2018)।

ভূমির খতিয়ান ডিজিটাইজ করার ফলে একটি খতিয়ান থেকে আরো কয়টি খতিয়ান তৈরি করা হয়েছে সেটা জানা যাবে। অধিকন্তু, মূল খতিয়ানের অন্তর্গত জমি এবং মূল খতিয়ানের অন্তর্গত অন্যান্য খতিয়ানের জমির পরিমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা যাবে। এছাড়া, খতিয়ান ডাটাবেজ নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বিত হলে একই জমি বারবার বিক্রি হওয়ার কোনো ধরনের সুযোগ থাকবে না এবং জাল দলিল তৈরি রোধ হবে। বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় 'মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল মৌজায় ডিজিটাল ও স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে মানচিত্র তৈরি করে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে (Hossain, 2017)। দেশের ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪১২টি মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজ করার ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিজিটাইজ ম্যাপের সঙ্গে ক্রয় করা স্যাটেলাইট ভূমির ছবি সমন্বয় করা হবে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কার্যকর ডিজিটাল ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপ তৈরি হবে। এছাড়া, 'বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে' তথা 'বিডিএস' শুরু হবে কয়েকটি জেলায় যা পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। নাগরিকদের সুবিধার্থে তাদের বাড়ি, অফিস, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির হোল্ডিং ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। ফলে তাদের ইউনিয়ন ভূমি অফিসে না গিয়েই ভূমি কর দিতে পারছেন। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সমগ্র দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প'। ভূমি মালিকানা প্রমাণের জন্য উপযুক্ত অনেকগুলো দলিলাদির বদলে একটি "ভূমি মালিকানা সনদ" তথা 'সার্টিফিকেট অফ ল্যান্ড ওনারশিপ' চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে (Nahrin &

Rahman, 2009)। বিভিন্ন জনবহুল এলাকা স্টেশন, বিপণী-বিতান, উপজেলা অফিস কমপ্লেক্সের মতো বিভিন্ন জায়গায় ভুমি সেবা ডেস্ক স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাগরিকগণ প্রয়োজনীয় ফির বিনিময়ে জমির খতিয়ান, জমির ম্যাপ প্রিন্ট করতে পারবেন। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি কর্মকর্তাদের পারফরমেন্স মনিটরিং করা শুরু করেছে, অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে (বাসস, ২০২২)।

৩. অধ্যায় পরিশেষ

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে এই পরিবর্তন ভূমি ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমকে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে যথাযথভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি বিভিন্ন সমস্যাবলীর অস্তিত্ব থাকার ফলে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সাধারণ জনগণ প্রকৃত ভূমি সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

অধ্যায় ৫

তথ্য বিশ্লেষণ এবং আলোচনা

১. সূচনা

ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। উপরোক্ত অধ্যায়গুলোতে ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধারাবাহিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই পরিবর্তন ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতাসমূহকে কিভাবে ত্বরান্বিত করেছে এবং এখনো পর্যন্ত সমস্যাসমূহ বিদ্যমান থাকার পিছনে কী কী কারণ দায়ী তা খুঁজে বের করার জন্য প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত নেয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ভূমি ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের বিবর্তন হলেও ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতাসমূহ অবসান না হওয়ার পিছনে যেসব কারণ রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. ভূমি আইনের বিবর্তনের প্রভাব ও বিদ্যমান জটিলতাসমূহঃ

বাংলাদেশের ভূমি আইনগুলোতে এখনও বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার বিস্তার ও এর প্রাধান্য রয়েছে। ঔপনিবেশিককালের ভূমি সম্পর্কিত প্রধান আইনী কাঠামোগুলো মূলত ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের ওপর জোর দিয়েছে, কিন্তু কৃষকের ভূমিতে অধিকারের বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। এর প্রভাব বর্তমানেও রয়েছে যেমনঃ বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার নীতিও এই রাজস্ব সংগ্রহকেন্দ্রীক প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি (Ratnatunga

& Jabbar, 1978)। এছাড়া, ঔপনিবেশিকতার পরবর্তী পর্যায়ে ভূমি সংস্কারের ধারণার সাথে প্রজাস্বত্ব সংস্কার যোগ করা হলেও ভূমি মালিকানায় এই অসম বণ্টন ভূমি সংস্কারের একটি অমীমাংসিত সমস্যা হিসেবে রয়ে গিয়েছে। ঔপনিবেশিক আইন ও তার প্রয়োগ কৃষক শোষণ কমাতে এবং ভূমি মালিকানায় একই সম্পত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থকে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভূমি সংস্কার আইনের আইনী অভিপ্রায় প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে কারণ ঔপনিবেশিক আমলের পরও বাংলাদেশে কখনোই সাধারণ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ভূমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটলেও বিভিন্ন জটিলতাসমূহের অবসান ঘটেনি যেমন:

২.১ প্রাচীন ও অস্পষ্ট আইন

ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা বিদ্যমান থাকার পিছনে বড় ভূমিকা পালন করছে প্রাচীন ও অস্পষ্ট আইনগুলো। মূলত বৃটিশদের প্রণীত আইনে সমস্যা বা জটিলতার কারণে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা বিদ্যমান। বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার আইনগুলো বৃটিশদের প্রণীত আইনগুলোর সংশোধনী রূপ (ইসলাম, ২০১৮)। প্রাচীন ও অস্পষ্ট আইনসমূহের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাসমূহ যেমন: মালিকানায় বণ্টনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত না করা; সেটেলম্যান্টের মাধ্যমে একটি তাৎক্ষণিক রেকর্ড প্রস্তুতকরণ এর উপর গুরুত্ব জোরদার করা এবং প্রকৃত মালিকানা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা; ভূমি সিলিং, অধিগ্রহণ ও পুনবণ্টনের ক্ষেত্রে একটি সুসংগত, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল পদ্ধতি প্রয়োগ না করা; আমূল ভূমি সংস্কারের চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকবেলায় একটি দক্ষ প্রশাসনিক সংস্থা স্থাপন ও উন্নয়ন করতে না পারা ইত্যাদি (Billah, 2017) । এসকল সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকায় বর্তমান ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যাবলী জটিল রূপ ধারন করেছে । তবে বিশেষ করে দুর্বল ও দমনমূলক ভূমি আইন নীতি ভূমি ব্যবস্থার জটিলতাকে ত্বরান্বিত করেছে (বিল্লাহ, ২০১৯)। ভূমিকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ মামলা-মোকদ্দমা হয়ে থাকে ভূমি আইনের অস্পষ্টতা ও সহজবোধ্য না হওয়ার ফলে (আহমেদ, ২০১৮)। ভূমি মামলা নিয়ে জটিলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ভূমি আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে।

২.২ ভূমি মালিকানায় অসম বণ্টন

ভূমি আইনের বিরূপ প্রভাবের কারণে ভূমি মালিকানায় এখনো অসম বণ্টন বিদ্যমান (Ullah, 2020)। মূলত ভূমি মালিকানায় এই অসম বণ্টনের সূত্রপাত ঘটে বৃটিশ আমলের জমিদারি প্রথার মাধ্যমেই। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কোম্পানি যে জমিদারদের নিয়োগ দিয়েছিল তারা কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে কোম্পানিকে দিত। এরাই জমিদার এবং এরাই মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (আলম, ২০১৮)। বৃটিশ-পূর্বে সার্বজনীন ভূমির মালিকানা ছিল। ব্যক্তিমালিকানা ছিল না। ইংরেজরা জমিদারদের দায়িত্ব দেয়ার ফলে কৃষকের কাছে থেকে খাজনা আদায় করার জন্য তারা বিভিন্ন অত্যাচার চালাত এবং ব্যক্তিমালিকানা চালু করা হল

(ইসলাম, ২০১৮) । বৃটিশ শাসনের অবসানের পূর্বেই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্যে আইন সভায় উত্থাপন করা হলেও ১৯৫১ সালের পূর্বে আইন প্রণয়ন করা যায়নি। ১৯৫১ সালে আইন প্রণীত হলেও ১৯৫৬ সালের পূর্বে সমস্ত জমিদারি তথা যাবতীয় মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আর জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্যাধিকারীদের খাস দখলে থাকা একশত বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের দখলে এনে তা ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন করা যায়নি। ভূমি মালিকানায় বৈষম্য এখনো আছে (রহিম, ২০১৮)। প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ ভূমিহীন। ভূমি মালিকানায় ন্যায্যতা না এনে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং সুষম ভূমি বণ্টন সম্ভব নয়। বাংলাদেশে আমলের আইনগুলো খাজনা আদায়ের জন্য ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ। এটা কতটা রাষ্ট্রবান্ধব সেটা মূল্যায়ন করা হয়নি। কারণ অতিরিক্ত জমিগুলো সরকারের কাছে আসেনি। ভূমির সুষম বণ্টন কোনো আইনে আসেনি। সুষ্ঠু খাজনা ব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু রেকর্ড ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো ক্ষেত্রেই যোগ্য আইন করা হয়নি। নব্য শাসকগণের লোকজন ভূমি গ্রাস করেছে। নতুন টাকার মালিক জমি কিনেছে। গ্রাম বাংলার ৯০ ভাগ জমি ১০ ভাগ লোকের কাছে আছে। ভুমি সংস্কার আইন সামরিক সরকারগণ সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য করেছে। আসলে এটার মাধ্যমে কোন পরিবর্তন আনেনি (বিল্লাহ, ২০১৯)।

২.৩ কৃষক বর্গাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি

বাংলাদেশের ভূমি আইনগুলো বর্গাদার কৃষকের সংখ্যা এবং দারিদ্র বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে । যুগে যুগে বাঙালি কৃষক ভূমি হারিয়ে কৃষি শ্রমিক ও বর্গাদারে পরিণত হয়েছে (ফারুখ, ২০২০)। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত তার 'বাংলার কৃষক সমাজের শ্রেণিবিন্যাস' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন "১৮৮০-র দশক থেকে ১৯২০-র দশক পর্যন্ত সারা বাংলায় বর্গাদারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে । জমিদার ও জোতদার উভয়েই প্রজাস্বত্ব আইনগুলি এড়াবার জন্য প্রান্তিক চাষিকে ঋণজালে জড়িয়ে সমানে তার জমি হরণ করে সেই জমিতেই তাকে বর্গাদারে রূপান্তরিত করতে থাকে। জমি হস্তান্তরের খতিয়ানে দেখা যায় প্রান্তিক চাষির জমি জোতদারের হাতে চলে যাচ্ছে। জমি থেকে উৎখাত এই বর্গাদারদের চরিত্র উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বর্গাদারের থেকে ভিন্ন। বর্গাদারের এই নতুন প্রজন্ম ভূমিহীনতায় বিপন্ন শোষিত এক কৃষকশ্রেণি। সরকার এদের কোন আইনের স্বীকৃতি দেয়নি। এদের জমিতে অধিকার ছিল না এবং জোতদারকে দেয় ফসলের পরিমান নির্দিষ্ট ছিল না। নানা ঋণের বোঝা চাপিয়ে জোতদার বর্গাদারের কাছ থেকে ফসলের সিংহভাগ আদায় করতে থাকে। এরা ছিল সম্পূর্ণ নিরুপায়। বিশ্বের বাজারে বাংলার পণ্যশস্য যোগান দেবার ব্যাপারে জোতদার ছিল বৃটিশ বণিকদের সহচর। তাই সরকার জোতদারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো আইন পাস করেনি "(পালিত, ২০০৭)। পাকিস্তান আমলে ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ সালে সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ করে বর্গাদারদের উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুভাগ দেয়ার জন্যও

সুপারিশ করেছিল (বড়ুয়া, ২০১৫)। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের ফলে মুসলিম লীগ দলীয় মন্ত্রীসভা বঙ্গীয় আইন সভায় উত্থাপনের জন্য বর্গাদার বিল প্রণয়ন করেছিল এবং ১৯৪৭ সালে তা আইন সভায় উত্থাপিত হয়েছিল। তবে আইন সভার বেশিরভাগ জোতদার সদস্যদের বিরোধিতার ফলে তা আইনে পরিণত হতে পারেনি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসলেও বর্গাদারদের প্রতি সকল অবিচার প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আমলেও কোনো সরকার বর্গাদারদের দুরবস্থা নিরসনের জন্যে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার আইনে বর্গাচাষিদের দুর্দশা নিরসনের বিধান করা হলেও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার কোনো ফলপ্রসু পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি (ইসলাম, ২০১৮)।

২.৪ ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি

স্বাধীনতার পর জমি দখলে রাখার অধিকার একশত বিঘায় নির্ধারিত হলেও জোতদার শ্রেণি নানা কৌশলে বর্ধিত জমি তাদের দখলেই রেখে ভূমিহীন, বর্গাচাষি ও কৃষকদের ওপর শোষণ করতে থাকে (চৌধুরী, ২০২১)। সরকারি হিসাবে চিহ্নিত ১২ লক্ষ একর কৃষি খাস জমির ৪৪% গরিব, ভূমিহীন ও দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে উল্লেখ থাকলেও গবেষণায় এই হিসেব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। মূলত কৃষি খাস জমির ৮৮% ধনী এবং প্রভাবশালীরা অবৈধভাবে দখল করে আছে। ভূমিহীন জনগণের দখলে আছে মাত্র ১২% কৃষি খাস জমি। এই খাস জমির অসম বণ্টনের ক্ষেত্রে ভূমি অফিসের দুর্নীতিকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এক একর খাস জমি পাবার জন্য গড়ে ৭-১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। একখণ্ড খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য একজন সুফলভোগীকে গড়ে ৭২ কর্মদিবস ব্যয় করতে হয় যা এই কাজে সরকারের ঘোষিত সময়ের চেয়ে ২৪ গুণ বেশি (বারকাত, ২০১৬)। খাস জমি-জলার অসম বণ্টন ও বন্দোবস্ত স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের আমলে হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারের ভূমি সংস্কার আইন এর যথাযথ প্রণয়ন ও সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে (ফারুখ, ২০২০)। সাধারণ জনগণের পাশাপাশি আদিবাসীরাও ভূমিহীন হচ্ছে সঠিক আইন প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের অভাবে (সিরাজী, ২০১৯)।

২.৫ ভূমি সংস্কার সফল্ভাবে না হওয়া

ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের বিধান কার্যকর করার জন্য ভূমি সংস্কার বিধিমালা প্রণীত হলেও ঐ বিধিমালা প্রয়োগ করে ভূমিহীন ও বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার কোন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি (বিল্লাহ, ২০১৯)। ভূমি আইনের বিবর্তন হলেও আইনের বিধান বাস্তবায়িত না হলে যাদের জন্য আইন করা হয় তারা আইনের সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে (ইসলাম, ২০১৮)। মূলত ঔপনিবেশিক ভূমি আইন কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং ঔপনিবেশিক আমলের পরেও এর ধারাবাহিকতা রয়ে গিয়েছে। বৃটিশ আমলের ভূমি সংস্কার

আইনগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অত্যধিক ও তীব্র সমস্যায় বিদ্যমান থাকা। এছাড়া বর্তমান ভূমি সংস্কার আইনে বিভিন্ন বাতিলকৃত ধারাগুলোর উপস্থিতি থাকা যেগুলোর সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিরূপ প্রভাব রয়েছে বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে । যেহেতু বৃটিশ আমলের আইনগুলো দীর্ঘ, সমস্যায় জর্জরিত, জটিল ভাষায় প্রণীত হয়েছিল সেহেতু ভূমি সংস্কার আইন সফলভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়েছিল বাংলাদেশ আমলে। অধিকন্তু, বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে মোক্ষম সময়েও আদালতগুলো ধীর গতিতে চলে এবং পরিচালনা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে ভূমি সংস্কার ব্যর্থ হচ্ছে। সুতরাং, এ থেকে বোঝা যায় যে ঔপনিবেশিক আমলের পরবর্তী সংস্কার আইনগুলিও কার্যকরভাবে একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল (বিল্লাহ, ২০১৯) ।

২.৬ সাধারণ জনগণের ভূমি আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা

ভূমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তন সংঘটিত হলেও সহজ ও বোধগম্য আইনের অভাবে সাধারণ জনগণ ভূমি আইন সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ। বৃটিশ আমলের জটিল ভূমি আইন দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠির নিকট ও সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য নয় (মনি, ২০২০)। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ আমলেও কোন সরকার সাধারণ জনগণের কথা চিন্তা করে আইন সংশোধন করে সহজরূপে প্রণয়ন করেনি। এছাড়া, আইন প্রণেতা ও বাস্তবায়নকারীদেরও সদিচ্ছার অভাবে সাধারণ জনগণ ভূমি আইন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না (হুদা, ২০১৯)।

৩. ভূমি প্রশাসনের বিবর্তনের প্রভাব ও বিদ্যমান জটিলতাসমূহ:

ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে বর্তমানে বিস্তৃত ভূমি প্রশাসন গড়ে উঠেছে, তবে ভূমি ব্যবস্থার সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম এক ছাতার নিচে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ভূমি ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে ভূমি ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে পারছে না। ভূমি প্রশাসনে পরিবর্তন আসলেও জটিলতা বা সমস্যাবলীর অবসান ঘটেনি। ভূমি প্রশাসনে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে যেমন:

৩.১ স্বতন্ত্র ভূমি প্রশাসন গড়ে না উঠা

ভূমি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে ঠিকই তবে ভূমি সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র ভূমি প্রশাসন এখনও গড়ে উঠে নি। ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী তিনটি মন্ত্রণালয়ের যেমন: ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদান করার

ফলে ভূমি প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিভিন্ন অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও ভোগান্তি বিদ্যমান রয়েছে (হাসান, ২০২২)। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকে এবং তাদেরকে অল্প প্রশিক্ষণ দিয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হয় যার ফলে ভূমি প্রশাসনে বিভিন্ন সমস্যা বা জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া মাঠ প্রশাসনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এখন রাজস্ব প্রশাসনের চেয়ে অন্যান্য কার্যক্রম অনেক বেড়ে গিয়েছে যার ফলে জেলা প্রশাসকের পক্ষে সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূভাবে ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব না। বৃটিশ আমলের রাজস্ব কর্মকর্তাদের যে দায় দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ছিল তা বর্তমানে জেলা প্রশাসনে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (খান, ২০২১)।

৩.২ ভূমি প্রশাসনে সমন্বয়ের অভাব

ভূমি মালিকানা, ভূমি হস্তান্তর, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি পরিচালনার জন্য ভূমি ব্যবস্থায় একটি দক্ষ ও সুসজ্জিত প্রশাসন থাকা বাঞ্চনীয় (Williamson, 2000)। ভূমি প্রশাসনের সার্বিক কাজ ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে তবে ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ভূমি নিবন্ধন অফিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূমি নিবন্ধন অফিস আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি দেখা যায় এবং ভূমি প্রশাসনিক কার্যক্রমে জটিলতার সৃষ্টি হয় (বারাকাত, ২০১৬)। ভূমি হস্তান্তর ও নামজারি, জমাভাগ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে একই স্থানে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাব রেজিস্ট্রার বা উপনিবন্ধন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কার্যালয় স্থাপন করার চিন্তা করা হলেও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে সঠিক ভূমি প্রশাসন আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্ত, ভূমি প্রশাসনিক কার্যক্রমে ভূমি হস্তান্তরের পর ভূমি নিবন্ধন ও নামজারি দুই ভিন্ন কার্যালয়ে থাকায় জনগণ একই অফিস থেকে ভূমি সেবা পাচ্ছে না (Akram, 2012)। এছাড়া, ভূমি নিবন্ধন কর্মকর্তা উপজেলা ভূমি অফিসকে সঠিকভাবে সহায়তা করে না। সাধারণত ভূমি নিবন্ধন কর্মকর্তা হস্তান্তরিত ভূমির বিবরণ সংবলিত বিজ্ঞপ্তি সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেন যাতে তিনি নোটিশের ভিত্তিতে গ্রহীতার নামজারি করতে পারেন, তবে বেশিরভাগ সময়ই উপজেলা ভূমি অফিসে সেটা সঠিক সময়ে পৌছায় না (হাসান, ২০২১)। ভূমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধন করার জন্য পৃথক কর্তৃপক্ষ চালু থাকায় ও দখল স্বত্ববিহীন ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ভূমি নিয়ন্ত্রণে ভূমি প্রশাসনের ব্যর্থতার ফলে ভূমি বিরোধ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ভূমি বিরোধজনিত দাঙ্গাহাঙ্গামা ও মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে

(হক, ২০১৬)। ভূমি প্রশাসনের বিবর্তন হলেও সঠিক ভূমি প্রশাসন আইন এবং কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামোর অভাবে ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতার অবসান ঘটছে না (বিল্লাহ, ২০১৯)।

৩.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি

পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালের আইনের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব প্রশাসন তৈরি করা হয়েছিল। এই আইনের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসন তৈরি করা হলেও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচানার জন্য সুদক্ষ জনবল ও সক্ষমতা ছিল না (ভূঞা, ২০০৪)। তখন থেকেই প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ সরকারি পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তবে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য যে পর্যাপ্ত ও দক্ষ লোকবল দরকার তা গড়ে ওঠেনি । ভুমি প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ না দেয়ার ফলে একটি অদক্ষ ও দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ প্রশাসন সৃষ্টি হয়েছে (Sakib et al., 2022)। বর্তমানেও বহু অদক্ষ ও অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ভূমি ব্যবস্থায় নানাবিধ সমস্যাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে (সিরাজী, ২০১৯)। ভূমি সেবাগ্রহণ করার জন্য ভূমি মালিকদের ভূমি প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমান ঘুষ দিতে হয় যা ভূমি প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় সৃষ্টি করছে। সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জনে ভূমি প্রশাসন পিছিয়ে পরছে (বারকাত ও রায়, ২০০৬)। অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য জমির মালিকরা প্রতিনিয়ত নায্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (Masum, 2017)। খাস জমি বণ্টনের বিভিন্ন পর্বে ঘুষের মাধ্যমে নির্দেশিত এই অবাধ দুর্নীতির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সবচেয়ে, গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ নিম্নরূপ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত: স্বচ্ছতার অভাব, দুর্বল (অপ) পরিচালনা (দায়বদ্ধতার অভাব থেকে উদ্ভুত), দরিদ্র জনগণের অজ্ঞতা, দুবর্ল সুশীল সমাজ, দুর্বল কৃষক আন্দোলন, ইত্যাদি (আলম, ২০১৮)।

৩.৪ মানুষের দ্রুত সেবা প্রদানে জটিলতা

ভূমি প্রশাসনে সমন্বয়ের অভাবে ভূমি সংক্রান্ত ডকুমেন্টের/রেকর্ডের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন: ভূমি প্রশাসনের নিবন্ধন অফিস, রেকর্ড অফিস ও সেটেলমেন্ট অফিস থেকে ভূমি মালিকগণ ভিন্ন ভিন্ন ডকুমেন্ট নিয়ে এসে মালিকানা দাবি করে সেক্ষেত্রে বিরাট দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে যা মামলা-মোকদ্দমা করেও সমাধান পাওয়া যায় না (খান, ২০২১)। এছাড়া, ভূমি প্রশাসনে এখনও ম্যানুয়ালি অনেক ভূমি সেবা প্রদান করা হচ্ছে যার কারণে জনগণের ভূমি সেবা পেতে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। ভূমি প্রশাসনকে ডিজিটাল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তবে দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাব ও যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে তা সঠিকভাবে সফল হতে পারছে না। ফলে ভূমি সেবা পেতে সাধারণ মানুষের এখনও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে (আলম, ২০১৮)।

৪. ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রভাব ও বিদ্যমান জটিলতাসমূহ:

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে ডিজিটাল পদ্ধতি সূচনার মাধ্যমে। ম্যানুয়াল পদ্ধতি থেকে বের হয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাজ করছে। তবে ভূমি ব্যবস্থাপনা এখনও জনগণকে ভূমি সেবা প্রদানে সময় ও অর্থের অপচয় এবং ভোগান্তির নিরসন ঘটাতে পারেনি। ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসলেও খাস ভূমির সুষম বন্টণ এবং বিভিন্ন জলমহাল, বালুমহাল ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়নি স্থানীয় প্রভাবশালীদের অবৈধ দখল ও তাদের স্থানীয় ভুমি প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগের কারনে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জটিলতাগুলো হলোঃ

৪.১ সহজ ও দ্রুত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অভাব

ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানে পরিবর্তন আসলেও সহজভাবে ও দ্রুততার সাথে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে (রহমান, ২০২০)। ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ম্যানুয়ালি যেসব ভূমি ব্যবস্থাপনা করে থাকে সেক্ষেত্রে অনেক সময় ক্ষেপণ করে থাকে। এছাড়া, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় অনেক সময় কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ না পাওয়ার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে ভূমি সেবা সহজ ও দ্রুততার সাথে প্রদান করে না। বিভিন্ন আমলে বিভিন্ন সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ব্যবস্থাপনাকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে সহজ ও দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে (হায়দার, ২০২২)।

৪.২ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান

ভূমি প্রশাসন ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রাচীন আমল থেকেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জনগণকে ভূমি সেবা প্রদান করে আসছে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় আসলেও ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ২০০৮ সালের পূর্বে আধুনিকায়নের উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে (রহমান, ২০২০)। তবে, গ্রামের সাধারণ জনগণ ভূমি সেবার আধুনিকায়ন ব্যবস্থায় এখনো সম্পূর্ণ রূপে পরিচিত হয়নি এবং তারা বিভিন্ন ভূমি সেবা গ্রহণ করতে ম্যানুয়ালি সেবার ওপরে নির্ভর করে। এছাড়া, দেশের প্রত্যেক ভূমি অফিস সম্পূর্ণ রূপে ডিজিটাল ভূমি সেবার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেনি। এখনও, কিছু কিছু অঞ্চলে ম্যানুয়ালি ভূমি সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং এর ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে যেমন: জনগণকে গ্রাম থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে পর্চার আবেদন দাখিল করতে হয়। জেলা রেকর্ড রুম থেকে হাতে লেখা পর্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পুনরায় আবার পর্চা ডেলিভারি নিতে নাগরিকদের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসতে হয়। এতে মানুষের খরচ ও ভোগান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে (হাসান, ২০২২)। কিছু কিছু ভূমি অফিসে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সূচনা ঘটালেও বাস্তবে পর্যাপ্ত আধুনিকায়নের যন্ত্রপাতির অভাব, অদক্ষ লোকবল, যথাযথ

Dhaka University Institutional Repository

ট্রেনিং এর অভাব, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগের অভাব ইত্যাদের ফলে ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা বা সমস্যা রয়েই গিয়েছে (খান, ২০২১)।

৪.৩ অদক্ষ লোকবল ও যন্ত্রপাতির অভাব

ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় বিবর্তনের ফলে অনেক ভূমি সেবা এখন ডিজিটালভাবে প্রদান করছে। তবে এই ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় এখনও জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। বৃটিশ আমল থেকেই ভূমি ব্যবস্থাপনায় ম্যানুয়ালি ভূমি সেবা প্রদান করা হত যার ফলে ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন জটিলতা বা সমস্যা রয়ে গিয়েছে। এ জটিলতা অবসানের লক্ষ্যে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সাল থেকে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ভূমি ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। এর পিছনে বহুবিধ কারণ দায়ী যেমন: ভুমি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ম্যানুয়ালি প্রশাসনিক কার্যক্রমে অভ্যস্ত বিধায় ডিজিটাল সেবা প্রদানে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, ডিজিটাল সেবা প্রদানের যন্ত্রপাতির অভাব, নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের অভাব ইত্যাদি (হাসান, ২০২১)।

৪.৪ স্থানীয় ভূমি প্রশাসনের ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপ প্রয়োগ

ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিবর্তন হলেও বৃটিশ আমল থেকেই ভূমিতে কৃষক বা সাধারণ জনগণের চেয়ে জমিদার/ জোতদার/ প্রভাবশালীদের প্রভাব রয়েছে (হুদা, ২০১৯)। পাকিস্তান আমলে মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার শ্রেণি সাধারণ কৃষকের চেয়ে ভূমিতে প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে দখল করে রেখেছিল (Siddik et al., 2018)। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং এদের অনুগত বিভিন্ন প্রভাবশালী স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ভূমিকে গ্রাস করেছে এবং দখল করে রেখেছে। ফলে স্থানীয় ভূমি প্রশাসন চাইলেও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করতে পারেনি (চৌধুরী, ২০২১)। খাসজমি, জলমহাল, বালুমহাল ইত্যাদির সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক নেতাবৃন্দ বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করে থাকে স্থানীয় ভূমি প্রশাসনের ওপর (হায়দার, ২০২২)। ফলে, ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভূমি প্রশাসন নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে যার ফলে এখনও বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। ভূমি ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রভাবশালীদের অবৈধ দখলের ফলে ভূমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতি মামলায় বাদী-বিবাদীর প্রচুর অর্থের অপচয় হচ্ছে (বারকাত ও রায়, ২০০৬)।

৪.৫ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় অপরিকল্পনা

ভূমি ব্যবস্থাপনায় নানা জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল ভূমি ব্যবহারের অপরিকল্পনা। ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে তথা নগরায়ন, রাস্তাঘাট ও স্থাপনা নির্মাণের কারণে কৃষি জমি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

(ফারুখ, ২০২০)। প্রতিদিন বাংলাদেশে গড়ে ২২০ হেক্টর জমি চলে যাচ্ছে শিল্প-কারখানা, বসতবাড়ি, বাঁধ এবং রাস্তাঘাট নির্মাণে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এভাবে গত ২০-২৫ বছরে বাংলাদেশে ৫০ লাখ একর কৃষি জমি বিলুপ্তির শিকার হয়েছে। শহর, পৌরসভা ও উপজেলা সদর সম্প্রসারণেও এভাবে ভূমির ব্যবহার হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে। ভূমির এ অপব্যবহারের ধারাবাহিকতায় মূল্যবান পুকুর, নদী, খাল, পাহাড়, জলাশয় ও বনভূমিও ধ্বংস হচ্ছে। দরিদ্র কৃষকের কৃষি জমি কিনে কোনো কোনো অঞ্চলের গ্রামগঞ্জে চোখ ধাঁধানো আবাসিক ভবন তৈরি হচ্ছে। আবাসন তৈরির এ প্রতিযোগিতায় গ্রামাঞ্চলের শত শত বিঘা কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে। বিত্তবানরা জমি কিনে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করছে বা ব্যবহার না করেই ফেলে রাখছে (মনি, ২০২০)। ভোগ্যপণ্য মজুদদাররা যেভাবে পণ্যসামগ্রী মজুদ করে, ঠিক বিত্তশালীরাও ভূমি কিনে অনুরূপভাবে মজুদ করছে। ফলে ধনী-গরিবের সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে এবং গ্রামের মানুষ ভূমিহীন হয়ে শহরে আসছে। মানুষ কৃষি পেশা ছেড়ে শহর, নগর, বন্দরে অকৃষি পেশা বা শ্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বস্তিবাসী আর ভূমিহীনের সংখ্যাও বাড়ছে (হুদা, ২০১৯)।

৫. ভূমি ব্যবস্থায় এসব জটিলতা বিদ্যমান থাকার কারণসমূহ:

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায় নানাবিধ জটিলতা বর্তমান থাকার পিছনে বহুবিধ কারন দায়ী। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় আসলেও ভূমি ব্যবস্থায় বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের প্রনীত আইন, প্রশাসন ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান থাকলেও তা সম্পূর্নরূপে পরিবর্তন করে কার্যকরী ভূমি আইন, সমন্বয়কৃত প্রশাসন ও সুপরিচালিত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় কাজ করেনি। বৃটিশ আমলের জমিদারদের পর আধুনিক সমাজে জোতদারদের ক্ষমতার কারনে সাধারন কৃষক সমাজ দিন দিন নিগৃহীত হয়েছে। বর্তমানে ধনী ও পুঁজিপতি শ্রেনী সাধারন মধ্যবিত্ত ও গরিব শ্রেনীকে বিভিন্ন মালিকানা ভূমি ও খাস ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে আরও ভূমির মালিকানা লাভ করে আরও ধনী হচ্ছে। ফলে সমাজে ভূমির অসম বন্টণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সামাজিক স্তরের বৈষম্য বিস্তৃত হচ্ছে। নিম্নে ভূমি ব্যবস্থায় বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান থাকার কারণগুলো আলোচনা করা হয়েছেঃ

৫.১ রাজনৈতিক কারণ:

ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা বিদ্যমান থাকার পিছনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন আমলের সরকার ভূমির সুষম বণ্টণের কার্যকরী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কোন সরকার বৃটিশদের প্রণীত ভূমি আইনসমূহ ভূমি ব্যবস্থায় সুষম ভূমি বণ্টন ও ভূমির সঠিক মালিকানা বজায় রাখতে কার্যকর কিনা সে লক্ষ্যে কাজ করেনি। বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন দলীয় সরকার ও সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসলেও কার্যকরী ভূমি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফলপ্রসূ উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেনি। যেসকল সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারা কতিপয় মধ্যস্বত্বভোগী জনগোষ্ঠীকে পুঁজি করে ক্ষমতায় টিকে থেকেছে যার ফলে এই মধ্যস্বত্বভোগীরা ব্যাপক পরিমান ভূমির মালিক হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অস্বচ্ছল ও গরিব জনগোষ্ঠী সকল সরকারের সময়ই উপেক্ষিত হয়েছে যার দরুন দিন দিন ভূমিহীন ও গরিব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.২ প্রশাসনিক কারণ

ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা বিদ্যমান থাকার পিছনে প্রশাসনিক কারণ অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে যার ফলে ভূমি প্রশাসনে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সহজ, সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে ভূমি সেবা প্রদানে বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন অফিসে জনগণ ভুমি সেবা প্রাপ্তিতে ভোগান্তিতে পরে ভুল ডকুমেন্টের কারণে । এছাড়া, বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিছু ভূমি সেবা প্রদান করলেও বেশিরভাগ ভূমি সেবা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দেয়া হচ্ছে। তবে যেসকল সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেয়া হচ্ছে সেখানেও বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। ভূমি প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ কর্মচারীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিকবান্ধব ভূমি সেবা প্রদান করার পূর্ণ মানসিকতা না থাকায় সমস্যা রয়ে গিয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ঠ দক্ষ জনশক্তি, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাব রয়েছে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায়। এসব বিষয় ছাড়াও ভূমি প্রশাসনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি করার প্রবণতা বিশেষ করে যেকোনো ভূমি সেবা প্রদান করার আগেই সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে বিভিন্ন অঙ্কের ঘুষ নেয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রমে জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে।

৫.৩ অর্থনৈতিক কারণ

ভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যার অর্থনৈতিক চাহিদার কারণে ভূমিকে নিয়ে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়ে থাকে যা ভূমি ব্যবস্থার জটিলতাকে ত্বরান্বিত করছে। দেশের কতিপয় পুঁজিবাদী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ভূমিকে দখল করে এবং পুঁজি করে অধিকাংশ সাধারণ মানুষকে ভূমি থেকে বঞ্চিত করছে যার ফলে দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, ভূমির অর্থনৈতিক চাহিদার কারণে সকল সরকারের সময়ই ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বিভিন্ন খাস ভূমি গ্রাস করে যার ফলে ভূমি মালিকানায় অসম বণ্টণের জটিলতা বাড়ছে। ভূমি নিয়ে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এর সূত্রপাত প্রাচীন যুগ থেকেই হচ্ছে। তবে বর্তমানে দেশের অধিকাংশ মামলা-মোকদ্দমা ভূমি নিয়ে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত কেন্দ্রিক। এসব মামলা-মোকদ্দমা চালাতে গিয়ে বাদী-বিবাদী সবাই প্রচুর অর্থের অপচয় করছে। এই আর্থিক অপচয় থেকে সাধারণ জনগণের মুক্তি লাভ করা অসম্ভব হয়ে পরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ সামাজিক কারণ

সমাজে প্রচলিত ধারণানুযায়ী মানুষের উঁচু অবস্থান নির্ধারণ হয়ে থাকে যার যত বেশি ভূমির মালিকানা রয়েছে তার ওপর। এখনও ভূমি ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম নির্ণায়ক। ফলে সমাজের ধনীশ্রেণি তাদের সামাজিক অবস্থানকে ঠিক রাখার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রতারিত করে কম মূল্যে ভূমি ক্রয় করে বেশী ভূমির মালিকানা লাভ করে থাকে। এছাড়া, বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে ভূমিতে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সরকারি খাসজমিগুলোও স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাপের কারণে প্রকৃত ভূমিহীন জনগণকে দেয়া সম্ভবপর হয়নি। যার ফলে সমাজ থেকে দারিদ্রতা বা ভূমিহীন সমস্যার মূল উৎপাটিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ভূমিতে সামাজিক বৈষম্য সবসময় ছিল এবং এখনও রয়েছে।

৬. অধ্যায় পরিশেষ

এ অধ্যায়ে প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে মাধ্যমিক উৎসের তথ্যর সাথে বিশ্লেষণ করে ভূমি ব্যবস্থার জটিলতাসমূহ ও এর বিদ্যমান থাকার পিছনের কারণগুলো খুঁজে বের করা হয়েছে। বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থার জটিলতাগুলো ঘনীভূত হচ্ছে ভূমি নিয়ে দ্বন্দ্ব ও মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। এই জটিলতাকে নিরসন করার জন্য সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৬

সুপারিশ ও উপসংহার

১. সূচনা

ভূমি ব্যবস্থায় নানাবিধ জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে এবং এই জটিলতা অপরিবর্তিত থাকার পিছনে বহুবিধ কারণ দায়ী। ভূমি ব্যবস্থায় এই অপরিবর্তিত জটিলতাসমূহকে নিরসনের জন্য সরকারসহ জনগণের ব্যাপক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। টেকসই ভূমি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার, জনগণ, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজসহ প্রত্যেক প্রতিনিধিকে যার যার অবস্থান থেকে সচেতন হয়ে গৃহীত কার্যকরী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ অধ্যায়ে ভূমি ব্যবস্থার জটিলতা সমূহ নিরসন করার জন্য কতিপয় সুপারিশ ও উপসংহার তুলে ধরা হয়েছে।

২. জটিলতা থেকে উত্তরণের সুপারিশঃ

- বৃটিশ আমলের আইনগুলোকে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার আলোকে সহজ, স্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে সংশোধন করতে হবে।
- ভূমির সুষম বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকারকে সুষ্ঠু ভূমি বণ্টন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ রোধ করতে হবে।
- ভূমি প্রশাসনে প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ভূমি প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে যাতে জনগণ একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল ভূমি সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে যাতে জনগণ সহজেই ভূমি সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- জনগণের সময়, অর্থ ও ভোগান্তির নিরসনে সকল ভূমি সংক্রান্ত কার্যাবলীকে ডিজিটাল করতে হবে। ম্যানুয়ালি সেবা প্রদানের জটিলতা থেকে মুক্ত করে তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ভূমিহীন ও বর্গাদার কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য নায্যতাভিত্তিক খাস ভূমি বণ্টন ও সুষ্ঠু ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- ভূমি সংস্কার আইন গরীবদের স্বার্থকে রক্ষার ক্ষেত্রে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে ভূমিহীন ও বর্গাদার কৃষকগণ ভূমি মালিকানা লাভ করতে পারে।
- ভূমি প্রশাসনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিকে রোধ করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের যথাযথ পর্যবেক্ষণ জরুরী। দূর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
- ভূমি ব্যবস্থাপনায় সকল ভূমি সেবা ডিজিটালভাবে সঠিক সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- ভূমির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনাকে সফল করার জন্য দক্ষ ও পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ করতে হবে। এছাড়া, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সকল সেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের জন্য ভালো মানের ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি সরকারকে ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিত করতে হবে।
- সাধারণ মানুষের ভূমি সেবা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। ভূমি আইন, ভূমি প্রশাসনের ভূমি সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিপত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে।
- ভূমি মালিকানায় সামাজিক বৈষম্যরোধের জন্য পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক নেতাবৃন্দদের বিভিন্ন খাস ভূমির ওপর অবৈধ দখল এবং ভূমি প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগ নিরসনে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ভূমি প্রশাসনের সকল অফিসে ভূমি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র ডিজিটাল করে সঠিক ও প্রকৃত ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভূয়া ও অবৈধ কাগজপত্র নিয়ে ভূমি মালিকানায় জটিলতার অবসান হয়।
- ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনের আওতায় সকল প্রকৃত কাগজপত্র নিয়ে বাদী-বিবাদীকে একত্রে মীমাংসা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. উপসংহার

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি আইন, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। ভূমি আইনের বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন আমলে ভূমি মালিকানা, হস্তান্তর, কৃষক ও সরকারের সম্পর্ক, ভূমি বিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হলেও ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা বিদ্যমান আছে। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে প্রশাসনিক কাঠামোয় বিভিন্ন পরিবর্তন আসলেও জটিলতার নিরসন হয়নি। অধিকন্তু, ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন আমলে বিভিন্ন পরিবর্তন ও ভূমি ব্যবস্থার জটিলতাকে হ্রাস করতে পারেনি। তাই বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাকে দক্ষ, গণমুখী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ভূমি আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে সুষ্ঠু ও সহজবোধ্য আইনী কাঠামো গঠন, সুসজ্জিত ও কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামো গঠন, যথাযথ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া ভূমিতে সুষম বণ্টণ নিশ্চিতকরণের জন্য সঠিক ভূমি আইন প্রণয়ন এবং এই আইনগুলো বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ও কার্যকর ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার দিকে সরকার ও সাধারণ জনগণের সফল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ভুমি প্রশাসনের উচ্চস্তর থেকে নিন্মস্তর পর্যন্ত সকল অফিসে সমন্বয় ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে যাতে করে সাধারণ জনগণ সঠিক সময়ে কম অর্থ খরচ করে দ্রুত ভূমি সেবা পেতে পারে। দক্ষ ও কার্যকর ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমান সরকারকে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সফল করার লক্ষ্যে সদা তৎপর থাকতে হবে। সাধারণ জনগণকেও ভুমি আইন ও প্রশাসনিক নিয়মাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে ধারনা রাখতে হবে। সর্বোপরি, ভূমি ব্যবস্থায় সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য যুগোপযোগী ও জনবান্ধব ভূমি আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমন্বয়কৃত ও দুর্নীতিমুক্ত ভূমি প্রশাসন এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে সহজবোধ্য ভূমি আইন, সুসজ্জিত ও কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামো, ফলপ্রসূ ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমিতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং ভূমি সংক্রান্ত সকল জটিলতার অবসান ঘটবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

Ahammad, S. U. (2017). The Dynamics of Agricultural Land Management System in Bangladesh: The Challenges for Sustainable Development. American Journal of Rural Development, , Vol. 5, No. 1, 5-18.

Akram, M. A. (2012). Problems of land use, Management and Administration and their Impacts on Environment: Bangladesh Perspective. লোক-প্রশাসন সাময়িকী

Alam, M., Roy, N., & Mina, N. (2015). Land Management and Services in Bangladesh: Governance Challenges and Way-forward. Dhaka, Bangladesh: Transparency International Bangladesh (TIB).

Ali, Z. (2011). Sustainable Land Management in Bangladesh: Issues, Constraints and Potentials. Dhaka, Bangladesh: BIDS.

Alim, M. A. (2009, 10 19). Land Management in Bangladesh with Reference to Khas Land: Need for Reform. Drake Journal of Agricultural Law.

Azad, M., & Uddin , M. (2012). Land Law and Land Survey. Dhaka: Lipi Law Book House.

Baden-Powell, B. (1892). The Land-systems of British India, being a manual of the land tenures and of the systems of land-revenue administration prevalent in the several Provinces. Vol. II. Book . Clarendon Press, London: Henry Frowde, Oxford University Press Warehouse, Amen corner and Stevens and Sons, Limited, 119 & 120 Chancery Lane.

Barkat, A. (2001). Political Economy of Khas Land of Bangladesh. Dhaka: BRAC.

Barkat, A., & Zaman, S. (2002). Khas Land in Bangladesh: The Nature of Adverse Inclusion of the Exclude and Doables, Land, Vol. 9. Dhaka, Bangladesh: ALRD.

Barkat, A., Zaman, S., & Raihan, S. (2000). Distribution and Retention of Khas Land in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: Association for Land Reform and Development (ALRD).

Dhaka University Institutional Repository

Billah, S. M. (2017). The Politics of Land Law: Poverty and Land Legislation in Bangladesh. Victoria University of Wellington.

CARE. (2003). Land Policy and Administration in Bangladesh: A Literature Review. Dhaka, Bangladesh: CARE Rural Livelihoods Programme.

Chowdhury, F. (2017). Bhumi Proshasoner Doinondin Karza Paddhati. 114/A, Shabujbagh, Bashaboo, Dhaka-1214.: Janani Art Press.

Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantative and Mixed Methods Approaches. United States of America: Sage Publications Ltd.

Das, D., Mallick, B., & Vogt, J. (2012). Social Process Analysis in Poverty Alleviation Program: A Study of Khas-Land Distribution in Rural Bangladesh. Journal of Bangladesh Institute of Planners, Vol. 5, 25-36.

Enemark, S. (2006). People, Politics and Places- responding to the Millennium Development Goals. Retrieved from https://www.researchgate.net/ publication/ 228675012

Enemark, S. (2009). Sustainable Land Administration Infrastructures to support Natural Disaster Prevention and Management. UN Regional Cartographic Conference for the Americas . New York.

Feldman, S., & Geisler, C. (2011). Land Grabbing in Bangladesh: In-Situ Displacement of Peasant Holdings. Global Land Grabbing. U.K: Land Deals Politics Initiative (LDPI).

Hasan, M. I. (2017). Land Administration in Bangladesh: Problems and Analytical approach to Solution. International Journal of Law, Volume 3, Issue 2, 44-49.

Hasnat, G., Siddik, M., & Zaman, A. (2018). Historical Evolution of Land Administration in Bangladesh. International Journal of Innovative Research, 3(3).

Herrera, A. (2016). Access to khas land in Bangladesh: Discussion on the opportunities and challenges for landless people, and recommendations for development practitioners. Eassay on Development Policy.

Dhaka University Institutional Repository

Hossain, M. (2015). Improving Land Administration and Management in Bangladesh. Dhaka: Bangladesh Institte of Development Studies (BIDS).

Hossain, M. F. (2017). Digitalization of land records. Retrieved from https://www.insightsonindia.com/social-justice/issues-related-to-rural-development/digitization-of-land-records/

Islam, M. A. (2013). Mutation and Updating of Land Records in Bangladesh:. Dhaka: Institute of Governance Studies.

Islam, M. T. (2013). Lectures on Land Law. Dhaka: Northern University, Bangladesh.

Islam, M. T. (2018). Land law: text, cases and materials. Dhaka, Bangladesh: Centre for Human Rights and Legal Research.

Islam, S., Moula, G., & Islam, M. (2015). Land Rights, Land Disputes and Land Administration in Bangladesh-A Critical Study. Beijing Law Review, 193-198.

Kabir, L. (1961). Land Laws in East Pakistan (Vol. 3). Dhaka: East Pakistan Law Society.

Masum, F. (2017). Rural land management in Bangladesh: problems and prospects. Geomatics, Land management and Landscape No. 4.

MOL. (1991). Land Management Manual. Ministry of Land, the Government of Bangladesh.

MOL. (2003). Land administration manual (Part 1). Ministry of Land, the Government of Bangladesh.

MOL. (2014). Land Administration Manual (Part 3). Ministry of Land, the Government of Bangladesh.

Nahrin , K., & Rahman, M.-U. (2009). Land Information System (LIS) for Land Administration and Management in Bangladesh. Journal of Bangladesh Institute of Planners, Vol. 2, 116-125.

Rabbi, R. (2019). Sustainable Land Record Management: A study of e-Mutation at Jashore Sadar Upazila.

Dhaka University Institutional Repository

Raihan, S., Fatehin, S., & Haque, I. (2009). Access to land and other natural resources by the rural poor: the case of Bangladesh. CIRDAP.

Ratnatunga, M., & Jabbar, M. (1978). Land Problems and Policy. Dhaka: FAO World Conference on Agrarian Reform and Rural Development.

Saif, A. M., & Hawlader, M. (2018). Land E-mutation System in Bangladesh: An Exploratory Study of A2I Program. Journal of Green Business School, Volume 1, issue 1, 109-118.

Sakib, N. H., Islam, M., & Shishir, M. J. (2022). National integrity strategy implementation in land administration to prevent corruption in Bangladesh. SN Social Sciences.

Shafi, S. A. (2007). Land Tenure Security and Land Administration in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: LGED, UNDP and UN-Habitat.

Siddik, M., Rahman, M., & Moniruzzaman, M. (2018). Causes and Consequences of Land Disputes in the Coastal Area of Bangladesh. Eastern Geographer, Vol. XXIV, No. 2, 7-15.

Siddique, K. (1997). Land Management in South Asia: A Comparative Study. University Press Limited, Dhaka.

Swamy, A. (2010). Land and Law in Colonial India. Retrieved from file:///D:/Land%20Paper_March/

Downloads/Swamy%20Land%20And%20Law%20In%20 Colonial%20India.pdf. Accessed 17 November 2019.

Talukder, S. K., Sakib, M. I., & Rahman, M. (2014). Digital Land Management System : A new initiative for Bangladesh. International Conference on Electrical Engineering and Information & Communication Technology (ICEEICT). : https://www.researchgate.net/publication/274458919 DOI: 10.1109/ICEEICT.2014.6919031.

Dhaka University Institutional Repository

Ullah, S. (2020). Peasant and land Question in Bangladesh . Retrieved from https://www.academia.edu/23758500/PEASANT_AND_LAND_QUESTION_IN_BANGLADESH

Williamson, I. P. (2000). Best Practices for Land Administration Systems in Developing Countries. International Conference on Land Policy Reform. Jakarta.

www.landministrybd.com. (2021). ভূমি মন্ত্রণালয় - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার । Retrieved from https://minland.gov.bd

আলবেরুনী, শ. ম. (২০১৫). বাংলাদেশ ভূমি ব্যবস্থা পনা সহায়িকা. ঢাকা: আর.আর. পাবলিকেশন্স.

আলী, এ. শ. (২০০২). বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থা এবং রাজনীতি. ঢাকা: বাংলা একাডেমি.

আহমদ. (১৯৯২). সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা: পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া. ঢাকা: সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ.

ইসলাম, স. (১৯৯৩). বাংলাদেশের ইতিহাস. ঢাকা: বাংলা একাডেমি.

ইসলাম, ক. (২০১০). ইংরেজ আমলে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস ১৭৬৫-১৯৪৭. ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন.

ইসলাম, ক. (২০১২). বাংলাদেশের ভুমি ব্যবস্থার ইতিহাসঃ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক. ঢাকা, বাংলাদেশ: মাওলা ব্রাদার্স.

ইসলাম, ক. (২০১৩). বাংলাদেশের ভূমি জরিপ ব্যবস্থার ইতিহাস. ঢাকা, বাংলাদেশ: মাওলা ব্রাদার্স.

এএলআরডি. (২০১৪). জমি-জমার কথা. ঢাকা, বাংলাদেশ: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভলপমেন্ট.

খান, ম. ন. (২০০৮). ভূমি আইনের সহজ পাঠ. ঢাকা: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব).

গাঙ্গুলী, ব. (২০১২). রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন. ঢাকা: কামরুল বুক হাউস.

দেবনাথ, ন. চ. (২০১০). বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত). ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ.

নওয়াজ, ড. আ. (২০১৪). বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ও ভূমি-সংস্কার (ঐতিহাসিক পর্যালোচনা). ঢাকা: অফিসার ব্রাদার্স, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়.

পলাশ, এ. হ. (২০২০). ভুমি ব্যবস্থাপনার সরল পাঠ . ঢাকা, বাংলাদেশ : নৈঋতা ক্যাফে .

পাল, ন. চ. (২০২১). বাংলাদেশের ভূমি আইন . ঢাকা, বাংলাদেশ : সামছ পাবলিকেশন্স .

Dhaka University Institutional Repository

পালিত, চ. (২০০৭). বাংলার কৃষক সমাজের শ্রেণিবিন্যাস, ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজচিত্র. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং .

বড়ুয়া, প. (২০১৫). বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের নতুন ভূমি প্রাপ্তির সুযোগ সংক্রান্ত সহায়িকা. ডিসপ্লেসমেন্ট সলুশ্যনস এবং ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন).

বাংলাপিডিয়া. (২০১৪). ভূমি প্রশাসন. Retrieved 2020, from bn.banglapedia.org/index.php/ভূমি প্রশাসন

বারকাত, ড. আ. রায়, প. (২০০৬). বাংলাদেশের ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা. ঢাকা, বাংলাদেশ: পাঠকসমাবেশ.

বারকাত, ড. আ. (২০০৪). বাংলাদেশে ভূমি-মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা. ঢাকা.

বারাকাত, আ. (২০১৬). বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি.

বাসস. (২০২২). ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আসবে . Retrieved from https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/43021

ভূঞা, ম. র. (২০০৪). যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা: পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল. চট্টগ্রাম.

মজুমদার, ম. প. (১৯৯৪). বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ.

মিয়া, ম. আ. (২০০৬). ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা. ঢাকা, বাংলাদেশ: এ কে পাবলিকেশন.

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন. (১৯৫০). www.bdlaws.minlaw.gov.bd. Retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-241.html

সরকার, জ. ন. (২০২০). বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইন. ঢাকা, বাংলাদেশ : কামরুল বুক হাউস.

স্বপন, হ. উ. (২০১৭). আদিবাসীদের সামাজিক ভূমি অধিকার এবং বর্তমান চিত্র . Retrieved from https://www.dw.com/bn/আদিবাসীদের-সামাজিক-ভূমি-অধিকার-এবং-বর্তমান-চিত্র/ধ-৩৯৪০০০৮৭

সিদ্দিকী, ক. (১৯৯৩), ভূমি সংস্কার; স. ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা: বাংলা একাডেমি ।

সিদ্দিকী, ড. ক. (১৯৭৯). বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি. ঢাকা, বাংলাদেশ: শোভা প্রকাশ.

হক, ক. এ. (২০১৬), ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা র ক্রমবিকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার

আলম, ক. ম. (২০১৮, ১১ মে), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আহমেদ, ম. (২০১৯, ২০ এপ্রিল), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

ইসলাম, ড. ত. (২০১৮, ২৪ নভেম্বর), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

খান, ম. দ. (২০২১, ৮ মে), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

চৌধুরী, ম. (২০২১, ২০ অক্টোবর), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

ফারুখ, ড. আ. (২০২০, ২৭ নভেম্বর), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

বিল্লাহ, স.ম. (২০১৯, ২২ জুন), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মনি, র. (২০২০, ২৯ নভেম্বর), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

রহমান, স.ম. (২০২০, ১২ ডিসেম্বর), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

রহিম, আ. ম. (২০১৮, ২৪ মার্চ), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

সিরাজী, র. আ. (২০১৯, ২৯ জুন), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হায়দার, জ. উ. (২০২২, ১৮ই মার্চ), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হাসান, ম. (২০২১, ১৩ই অক্টোবর), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হাসান, শ. (২০২২, ৯ই ফেব্রুয়ারি), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হুদা, শ. (২০১৯, ২৯ শে জুন), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি আইন ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন এসেছে?

২. ভূমি আইন ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি সংক্রান্ত আইনগত জটিলতার কী কোনো পরিবর্তন ঘটেছে?

৩. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন এসেছে?

৪. ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জটিলতার কী কোনো পরিবর্তন ঘটেছে?

৫. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন এসেছে?

৬. ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় জটিলতার কী কোনো পরিবর্তন ঘটেছে?

৭. ভূমি ব্যবস্থায় বিদ্যমান জটিলতাসমূহের কারণগুলো কী কী?